
জীবজগতের
বিস্ময়

জীব জগতের বিস্ময়

৪.৭

৫৪৭

ডঃ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

মালা পাবলিকেশন্‌স্‌

৫১, কালিনাথ মুন্সী লেন

কলিকাতা-৭০০০৩৬

JIB JAGATER BISMAY

By

Dr. Arun Kumar Chattopadhyay

Mysteries of animals and botanical world

প্রকাশক :
আশিস্‌কুমার বর্দ্ধন
মালা পাবলিকেশন্‌স
৫১, কালিনাথ মুন্সী লেন
কলিকাতা-৭০০০৩৬

© অসীমা চট্টোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ :
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪
দ্বিতীয় সংস্করণ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮

মূল্য : বারো টাকা

মুদ্রাকর :
পরেশনাথ পান
ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

Acc. No. - 14811

প্রাপ্তিস্থান
মালা পাবলিকেশন্‌স্
৪, নিমাই বোস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

কয়েকটি কথা

পৃথিবীর খোলা-চিড়িয়াখানার প্রবেশ মূল্য নেই বলেই বোধ হয় আমরা দল-বেঁধে জীবজন্তুদের দেখতে যাই না। অবশ্য যাঁদের মনের তাগিদ আছে তাঁরা এদিক-ওদিক ছুটে বেড়ান, আর দু'চোখ ভরে যা দেখেন তা অভিজ্ঞতার ঝুলিতে পোরেন।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলবেন, দেখাটাই তো বড় কথা নয়, কোথায় দাঁড়িয়ে দেখতে হবে এটাই বড় কথা। এই কারণেই বিজ্ঞানীদের অভিমত হলো, পৃথিবী নামক গ্রহটিতে যেসব প্রাণীরা বসবাস করছে তাদের বন্ধন পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়। আর এটাই হলো পরিবেশ-বিজ্ঞানের কথা। এই কারণেই বিজ্ঞানীরা বলছেন, বন্য জীবজন্তুকে সংরক্ষণ করতে। মানুষ থেকে আণুবীক্ষণিক প্রাণীরা—মাটির বুকেই হোক্ কিম্বা গভীর জলেই হোক্—যে যার নিজের জীবন রক্ষা কোরে পারস্পরিক নির্ভরতায় জীবনযাত্রা চালাচ্ছে। তাই পৃথিবীর খোলা-চিড়িয়াখানা হলো সব থেকে বড় ল্যাবোরেটারী।

আমরা জানি জীবজন্তু আহার্য বস্তুর জন্য গাছ-গাছালি কিম্বা অন্য প্রাণীদের ওপর নির্ভরশীল। এক মাত্র গাছ-গাছালিরাই নিজেরা নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত কোরে নেয়। কিন্তু গাছ-গাছালি যেখানে মাংশাসী হয়ে ওঠে সেখানে তাদের আচরণটা বিস্ময়ের হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই 'জীবজগতের বিস্ময়' পর্যায়ে তাদের অনুপ্রবেশ ঘটে।

যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে আশিস্‌কুমার বর্দ্ধন পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলেন, তাঁর জন্যে রইলো অকুণ্ঠ ভালোবাসা। চিত্রশিল্পী স্বপন রায়চৌধুরী ও প্রহ্লাদ দে এবং ইন্দ্রলেখা প্রেসের কর্মীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

গড়িয়া,
১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮

ডঃ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

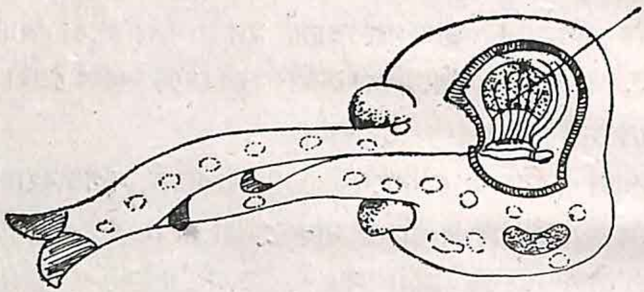
জলের তলায় বিদ্যুৎ তৈরীর কারখানা

বাজ ধরবার ফাঁদ মানুষ কতদিন আগে থেকে পাততে শুরু করেছিলো সে কথা বলা কঠিন। তবে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের কারখানা হাল-আমলের কাহিনী। ডাঃ গ্যালভানি, যাকে বলা হতো 'ব্যাঙ-নাচানো-ডাক্তার', তিনি কিন্তু দেখিয়েছিলেন জীবজন্তুর দেহে বিদ্যুৎ তৈরী হয়ে থাকে এবং ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব নয়।

কথাটা অবিশ্বাস্য শোনালেও একথা সত্যি যে, সাগর-মহাসাগরের বুকে যে-সব হাজার হাজার প্রজাতির মাছ ঘোরা-ফেরা করছে তাদের মধ্যেই রয়েছে বিদ্যুৎ-উৎপাদনকারী মাছ। আড়াই'শ-তিন'শ প্রজাতির মাছ আছে যারা নিজের দেহেই বিদ্যুৎ তৈরী করতে পারে। অবশ্য এই বিদ্যুৎকে জৈব-বিদ্যুৎ বলাই ভালো। এ সব প্রজাতির মাছগুলো হলো টর্পেডো (torpedo) যারা ক্রান্তীয় ও সমোষ্ণ এলাকায় থাকে; স্কেট (skate) ও স্নাউন্ট (snout) মাছগুলো থাকে আফ্রিকায়; এ ছাড়া আছে ইলেকট্রিক এল (e'ectric eel), ইলেকট্রিক ক্যাটফিশ (electric catfish) এবং স্টারগেজার (stargazer)।

এই সব মাছগুলোর পেশী-কলা (mascular tissue)-গুলো এমন ভাবে গড়ে উঠেছে যাতে তাদের দেহের সঙ্গে বিদ্যুৎ তৈরী হয়। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই বিদ্যুৎ-অঙ্গকে বলে ইলেকট্রোপ্লেট (electroplate) বা ইলেকট্রোপ্লেক (electroplaque)। তবে যে-সব মাছেরা নিজের দেহে নিজেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে তাদের দেহের ইলেকট্রোপ্লেটের আকার ও আয়তন একই ধরনের। টর্পেডো মাছেদের ক্ষেত্রে ব্রাংকিয়াল পেশী রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে বৈদ্যুতিক অঙ্গে। এর ফলেই খিলেন-করা-ফুলকোর কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আবার ইলেকট্রিক এল, স্কেট এবং স্নাউন্ট মাছগুলোর লম্বাটে ল্যাজার পেশীগুলোতে সৃষ্টি হয়েছে বৈদ্যুতিক অঙ্গ। ক্যাটফিশের দেহের মধ্যেকার পেশীতে এবং স্টারগেজারদের চক্ষু-

পেশীতে আছে বিদ্যুৎ-উৎপন্নকারী অঙ্গের অস্তিত্ব। সুতরাং বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনকারী মাছেদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও তাদের দেহের আদল এবং আয়তন ভিন্ন। মৎস্য প্রজনন বিষয়ে যাঁরা অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী তাঁরা বলছেন যে, বিবর্তনের পথে প্রতিটি প্রজাতির মাছ স্বতন্ত্রভাবে তাদের দেহে বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কারী অঙ্গগুলো গড়ে তুলেছে।



বৈদ্যুতিক অঙ্গ

এই সব মাছগুলোর বিদ্যুৎ-অঙ্গগুলো বেশ বড় গোছের ; বলতে গেলে মাছের ওজনের এক চতুর্থাংশ থেকে এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত হতে দেখা যায়। এল মাছ যতটা লম্বা হয় তার মধ্যে পাঁচ ভাগের চার ভাগ জুড়ে আছে এই বৈদ্যুতিক-অঙ্গ। আবার ক্যাটফিশের বেলায় এই বৈদ্যুতিক-অঙ্গ সারা দেহ জুড়ে থাকে। মাছের বৈদ্যুতিক-অঙ্গে অসংখ্য ফলক আছে, আর সেগুলো এক একটি আঁশের মধ্যে সংযুক্ত হয়ে থাকে। একটি থামের মধ্যে যে-সব ফলকগুলো থাকে সেগুলো 'সিরিজ' হিসাবে সংযুক্ত এবং প্রত্যেকটি থাম আবার সমান্তরালভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। মাছেদের বিদ্যুৎ-অঙ্গগুলো ভালোভাবে দেখলে মনে হবে এগুলো প্রকৃতির হাতে গড়া স্টোরেজ ব্যাটারী।

এই সব মাছেদের কঙ্কালের সঙ্গে যুক্ত যে-সব পেশী আছে তার চারদিক ঘিরেই রয়েছে বিদ্যুৎ-অঙ্গগুলো। কঙ্কাল-সংযুক্ত পেশীগুলোর সংকোচন হয় স্নায়ুর ঘাতের ফলে, আর তখনই বিদ্যুতের ঝলক্ জাগে। পেশীকলার স্নায়ুপ্রান্ত ভাগে যখন এই ঘাত পৌঁছোয় তখন এক ধরনের পদার্থের ক্ষরণ হয় ; এবং এই কারণেই পেশী কোষগুলো সংকুচিত হতে থাকে। আর

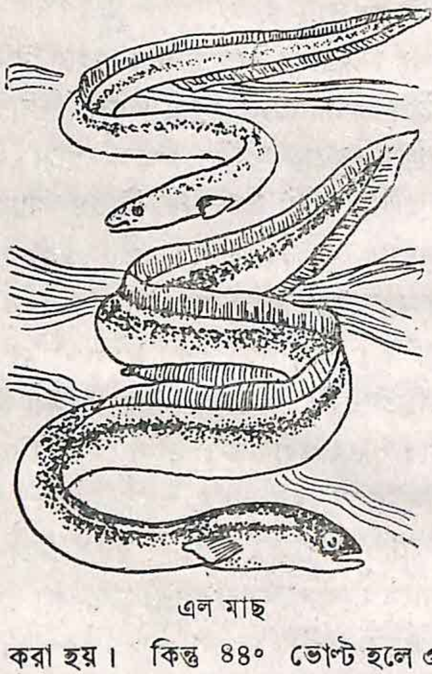
সংকোচন ঘটলেই বিদ্যুতের ঝলক ঠিকরে পড়ে। প্রকৃতি যেন নিপুণ গৃহিণীর মতো পরিবর্তিত এই সব ফলক ও পেশী কোষগুলো তৈরী করে দিয়েছে।

বিদ্যুৎ-প্রবাহ সুস্থিত রাখতে নাড়ীগুলো জেনারেটারের কাজ করে। ১৫০ মিলিভোল্ট হলো নাড়ীর স্পন্দন এবং এটাই হলো স্নায়ু ও পেশীকোষের স্বাভাবিক গতি। এল মাছের দেহে যে-সব ফলকগুলো সংযুক্ত হয়ে থামগুলো গড়ে তুলেছে, তাতে প্রত্যেকটি থামে ৬০০০ থেকে ১০,০০০ ফলক আছে। এই কারণে এখানকার ভোল্টেজ দাঁড়ায় ৬০০-র মত। টর্পেডো মাছের এক একটি থামে ১০০০টির বেশী প্লেট নেই, কিন্তু ২০০টির মতো থাম সমান্তরাল ভাবে সংযুক্ত থাকে। তাই টর্পেডো মাছের বিদ্যুৎ প্রভাব যথেষ্ট হলেও ভোল্টেজ বেশী হয় না।

এই ধরনের জটিল বিদ্যুৎ-অঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্যে মস্তিষ্কে একটা নির্দেশ-দেওয়া একক রয়েছে বা গড়ে উঠেছে। মস্তিষ্কের মেডুলা অংশে ডিম্বাকৃতি কেন্দ্র থেকেই বিদ্যুৎ-অঙ্গের কাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। বলতে পারা যায়, ডিম্বাকৃতি কেন্দ্রই হলো হেডকোয়ার্টার এবং এখনকার নির্দেশ অনুযায়ী বিদ্যুৎ-অঙ্গ তার সমস্ত কাজ চালায় বা বন্ধ রাখে। তবে একই সঙ্গে বিরাট পরিমাণ বিদ্যুতের ঝলক তুলতে গেলে বিদ্যুৎ-অঙ্গের সমস্ত ফলকগুলো একই সময়ে নির্দেশ পাওয়া উচিত। ব্যাপারটি বেশ জটিল। কেননা স্নায়ু-ঘাত-বল মন্থরগতিতে প্রবাহিত হয়। মাছের মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে এই ঘাত-বল ১ সেকেণ্ডে ৩০ মিটার পর্যন্ত প্রবাহিত হতে পারে। বিদ্যুৎ-অঙ্গের সামনের অংশটা, যেটা মস্তিষ্কের কাছাকাছি থাকে সেটির অন্য অংশের থেকে অনেক আগে নির্দেশ পাওয়ার কথা। হয়ত নির্দেশটি আগে যায় শেষ দিকে, পরে আসে সামনে, অথবা স্নায়ুর ঘাত-বল দ্রুত-গতিতে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে দৌড় দেয়। যদিও এ-সম্পর্কে গবেষণার অন্ত নেই, তবে এক সময় এই অনন্ত রহস্যের সন্ধান অবশ্যই মিলবে।

কেন যে এই সব মাছেদের এমন ধরনের বিদ্যুৎ-অঙ্গ এবং কি প্রয়োজনে এদের উদ্ভব সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এক মত নন। বিশেষজ্ঞদের অভিমত

হলো যে রক্ষণাত্মক ও আক্রমণাত্মক কাজের জন্যেই বিদ্যুৎ-অঙ্গের উদ্ভব হয়েছে। টর্পেডো এবং এল মাছ বিদ্যুতের শক্ দিয়ে তাদের শিকার-গুলোকে অবশ করে দেয় তারপর খাদ্য হিসাবে তা গ্রহণ করে। তা ছাড়া স্নাউন্টের মতো যে-সব মাছেরা ঘোলাটে জলে থাকে এবং যাদের চোখের শক্তি নিতান্তই দুর্বল বা অসংগঠিত তারা দুর্বল বিদ্যুৎ প্রবাহের সাহায্যে নিজেদের চারিদিকে বিদ্যুতের বলরেখা (lines of forces) তৈরী করে। যদি কোনো কিছুতে এই বল-রেখা ভেঙে দেয় তাহলে এরা সংকেত মারফত তাদের অস্তিত্ব বা উপস্থিতি বুঝতে পারে। এ সব মাছেদের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-অঙ্গ সতর্ক সংকেতের কাজ করে। তবে মস্তিষ্ক-কেন্দ্রের বিশেষ অংশের জন্যেই যে এদের এমন কাজ করার ধরন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।



এল মাছ

জলের তলায় বিশেষ বিশেষ প্রজাতির মাছেরা যে তাদের বিদ্যুৎ-অঙ্গ দিয়ে জৈব প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম তা পরীক্ষিত সত্য। ক্যাটফিশ উৎপাদন করছে ৪০০ ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ, তেমনি এল মাছ উৎপাদন করছে ৬০০ ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ। ব্যাপারটা শুধু বিস্ময়ের নয়, সাংঘাতিকও বটে।

আমাদের বাড়ীতে সাধারণত ২২০-২২৫ ভোল্টের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। কিন্তু ৪৪০ ভোল্ট হলে প্রত্যেককেই যথেষ্ট সাবধান হতে হয়, নচেৎ ভয়ঙ্কর বিপদের সম্ভাবনা থাকবেই। তা ছাড়া এল মাছ তার বিদ্যুৎ-অঙ্গ থেকে ১০০০ ওয়াটের মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে।

তবে একটা কথা বলে রাখা দরকার, আর তা হলো এ সব মাছেরা নিজের বিদ্যুতে নিজেরা শক খায় না। জলের তলায় যে বিদ্যুৎ তৈরীর

কারখানা রয়েছে তাতে রয়েছে প্রকৃতির হাতের গৃহিণীপনা ; বিজ্ঞানীরা গবেষণা কোরে আবিষ্কার করুন, কেন, আর কি জন্যে এই কারখানা ?

মানুষ কি এসব দেখে, বুঝে ও জেনে নতুন কায়দায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হবে ? এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীরা। আমরা তাঁদের উত্তরের অপেক্ষায় দিন গুনব।

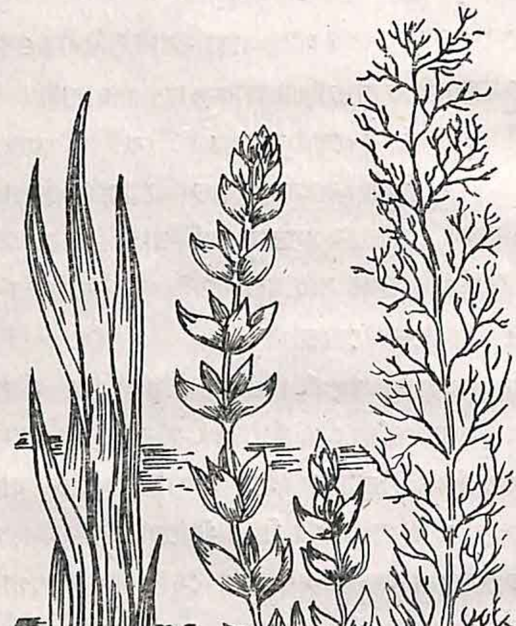
মাংশাসী গাছ-গাছালি

প্রাণের সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত গাছ-গাছালিরাই পৃথিবীর ওপর আধিপত্য বিস্তার কোরে রেখেছে। গাছ-গাছালির জীবনধারণ সাদামাটা। এরা সহিষ্ণু এবং অহিংস জীবন-যাপন করতেই অভ্যস্ত। কেউ আক্রমণ করলে এরা প্রতি আক্রমণ করে না। এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই উৎপাদন করে—বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন, সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া। এদের জীবন তাই সূর্যমুখী, কেননা সূর্যের আলোর সাহায্য নিয়েই এরা নিজেদের খাদ্য তৈরীর বিরাট বিরাট কারখানা গড়ে তুলেছে।

গাছ-গাছালিরা সাধারণ অর্থে নিরীহ। কিন্তু সব প্রজাতির গাছ-গাছালি অহিংস জীবন যাপন করে এ কথাটা ঠিক নয়। জীবনের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে এমন কিছু কিছু গাছ-গাছালি আছে যারা মাংশাসী হয়ে উঠেছে। বিশেষ কোরে যে-সব স্যাঁত-স্যাঁতে জোলা জায়গার মাটিতে নাইট্রোজেন-ঘটিত যৌগের অভাব দেখা যায় সেই সব জায়গায় এই সব গাছ-গাছালি জন্মায়—বংশ বৃদ্ধিও করে। স্বভাবতই পুষ্টির জন্যে এই ধরনের গাছ-গাছালি পোকা-মাকড় ধরে খায়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে ৪৫০-এর ওপর পতঙ্গভুক প্রজাতির গাছ-গাছালি দেখা-পাওয়া গিয়েছে। ভারতবর্ষে এ রকম পতঙ্গভুক প্রজাতির গাছ-গাছালির সংখ্যা ৩০-এর ওপর।

পুকুরে এক ধরনের ঝাঁঝি দেখতে পাওয়া যায় যাদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয় ইউট্রিকিউলেরিয়া। পুকুরে যে-সব ছোটো ছোটো পোকা, পোকার পিউপা বা লার্ভা থাকে এরা তাদের ধরে-মেরে খায়।

এদের কাটা-কাটা, সরু-সরু পাতা আছে এবং এই সব ছোটো ছোটো কাটা পাতার মধ্যে থাকে কতকগুলো কোরে থলি বা ব্লাডার। প্রত্যেকটা থলির মুখে থাকে একটা কোরে কপাট। জলের মধ্যে চলা-ফেরা করতে করতে ছোটো ছোটো জলের পোকারা কপাট ঠেলে থলির মধ্যে ঢুকে পড়ে, কিন্তু বেরিয়ে আসবার পথ পায় না। কেননা ভেতর থেকে কপাট আর খোলা যায় না। স্বভাবতই থলির মধ্যে তখন ছোটো-খাটো পোকাদের বন্দী দশা ; তারপর থলির ভেতরের গ্রন্থি থেকে ঝরতে থাকে পাচক রস, তাতেই



ঝাঁঝি

বন্দীদের মৃত্যু। মৃত পোকাগুলোর দেহ শেষ পর্যন্ত জীর্ণ হতে থাকে, আর সেগুলোকে হজম কোরে নেয় ঝাঁঝি।

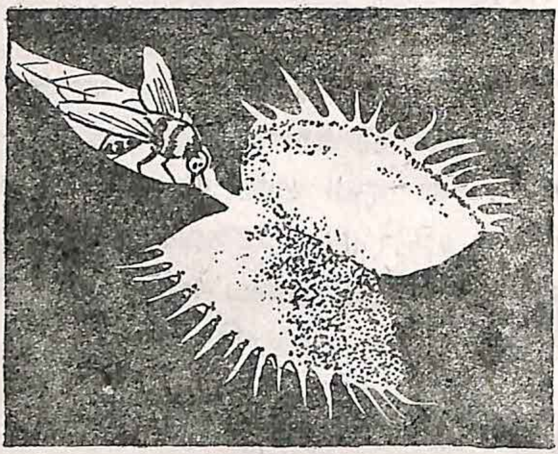
পতঙ্গভুক উদ্ভিদের আর একটি প্রজাতি হলো ড্রসেরা বা সূর্য শিশির বা

রৌদ্র-শিশির। এই প্রজাতির আর একটি চলতি নাম আছে, তা হলো মুখজালি। বিশেষ কোরে শীতকালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান এলাকায় এদের দেখতে পাওয়া যায়। এরা পিঁপড়ে, কীট-পতঙ্গের লার্ভা ধরে খায়, হজমও কোরে ফেলে।

ড্রসেরার দীর্ঘ পাতা-ঢাকা কেশরগুলোতে সূর্যের আলো পড়লে বেশ ঝলমল কোরে ওঠে। প্রত্যেকটি কেশরের আগায় আঠালো ধরনের রস জমা হয়। ছোটো-খাটো কীট-পতঙ্গেরা আকৃষ্ট হয়ে কেশরের আগায় বসলেই তাদের পা আর পাখনা জড়িয়ে যায়, আর যতই তারা পালাবার চেষ্টা করে ততই তারা জড়িয়ে যায়। এই ড্রসেরার উত্তেজনায় সাড়া দেবার কলাকৌশল লক্ষ্য করার মতো। প্রথমে যখন কীট বা পতঙ্গটি কেশরের আগায় বসে তখন কেশরগুলি এদিক-ওদিক থেকে গুটিয়ে বেঁকে এসে শিকারটিকে জড়িয়ে ধরে। যদি শিকারটি পাতার ধারে বসে তা হলে কেশরগুলি এমন কায়দা করে তখন শিকারটি পাতার মাঝখানে চলে আসে আনমনে। উত্তেজিত কেশরগুলো তখন এমন কোরে শিকারটিকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে তখন তার আর বেরুবার পথ থাকে না। এরপর বিন্দু বিন্দু কোরে ঝরতে থাকে পাচক রস, ফলে কীট বা পতঙ্গটি জীর্ণ হয়ে যায়। এর পরেই হজম করার পালা। খাওয়া-দাওয়ার কাজ শেষ হলে কেশরগুলো আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে, খাবারের জন্য শিকারের ফাঁদ পাতে।

পতঙ্গভুক গাছ-গাছালির মধ্যে, 'ভিনাস ফ্লাইট্রাপ' পয়লা নম্বরের মাংশাসী। আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার জলাভূমিতে এদের দেখতে পাওয়া যায়। 'ভিনাস ফ্লাইট্রাপের' পাতার শেষ দিকটা অর্থাৎ প্রান্তভাগটা ঝিনুকের খোলের মত দুটি ভাগে খোলা ও বন্ধ করা যায়। প্রত্যেকটি খোলায় তিনটে কোরে কাঁটা থাকে, তা ছাড়া ধারগুলো খাঁজ কাটা কাটা। কোনো কীট বা পতঙ্গ এই কাঁটা স্পর্শ করলেই পাতাটা দু'ভাগে ভাঁজ হয়ে যায় এমন ভাবে যাতে কিনারায় কিনারায় জুড়ে যায়। এই ভাবে কীট-পতঙ্গ বন্দী হয়। বন্দী-কীট বা পতঙ্গ শেষ পর্যন্ত জারক রসে জীর্ণ হয়ে মৃত্যু বরণ করে, আর 'ভিনাস ফ্লাইট্রাপ' শেষ পর্যন্ত আহার কোরে তৃপ্ত হয়। খাওয়া-দাওয়ার পর শিকারটি হজম হয়ে গেলে পাতাটি আবার দু'ভাগে খুলে যায়,

অর্থাৎ পুনরায় শিকারের আশায় ফাঁদ পাতে। বিশিষ্ট প্রাণী বিশারদদের মতে ভিনাস ফ্লাইট্রাপ ছোটো-খাটো ব্যাঙ হজম কোরে ফেলতে পারে। উদ্ভিদের প্রাণী শিকারের এটি সবচেয়ে বড় গোছের উদাহরণ।



ভিনাস ফ্লাইট্রাপ

আসামের খাসিয়া, জয়ন্তিয়া এবং গারো পাহাড়ে আর এক ধরনের মাংশাসী উদ্ভিদ দেখা যায় যাদের বলে কলস উদ্ভিদ (Pitcher plant)। অবশ্য চীন থেকে অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত এদের দেখতে পাওয়া যায়। তবে বোর্ণিওতে এরা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। এরা স্যাঁত স্যাঁতে ভিজে জায়গাতে থাকতে ভালোবাসে এবং বাড়-বৃদ্ধিও ভালো।

কলস উদ্ভিদের পাতাগুলো লম্বা লম্বা। পাতার ডগাটি দড়ির মতো এবং সেখান থেকে আঁকশির মতো কোরে ঝুলে থাকে (বা বসানো থাকে) চার থেকে আট ইঞ্চি লম্বা একটি দেখ্‌নাই গোছের কলস। কলসের মুখে আধখোলা অবস্থায় একটা ঢাকনি থাকে। ঢাকনির মুখটা কখনও পুরো খোলে না বা বন্ধও হয় না। জায়গাটা এমনই ধরনের যে কীট-পতঙ্গেরা বেশ ভালো বসবার জায়গা পায়। কলসের মুখে থাকে অনেকগুলি কোরে মধু-ঝরে পড়া গ্রন্থি। এই কারণেই কলসের ভেতর জমা হতে থাকে মধু। কীট-পতঙ্গরা বেশীর-ভাগ ক্ষেত্রে মধুর লোভে কলসের ভেতর ঢুকে পড়ে।

এর পরের অবস্থাটা খুবই সঙ্গীন। কলসের মধ্যেকার জমে-থাকা মধুর রসে মধু লোভীদের প্রাণ হারাতে হয়। এই রসটি হলো পেপসিন হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিডের সাহায্যেই মানুষ ও জীবজন্তু তাদের নিজ নিজ পাকস্থলীতে আমিষজাতীয় আহার্যকে জীর্ণ কোরে নেয়। স্বভাবতই কলস উদ্ভিদরা তা-ই কোরে থাকে।



কলস উদ্ভিদ

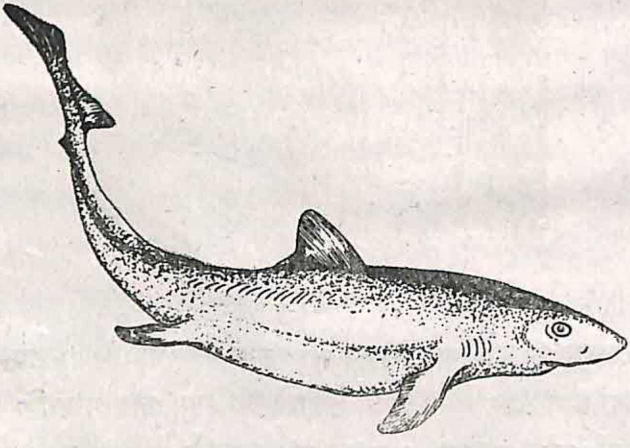
দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা এই সব পতঙ্গভুক গাছ-গাছালি নিয়ে বিরাম-বিহীন গবেষণা চালাচ্ছেন। বিশেষ কোরে সহিষ্ণু গাছ-গাছালি যেখানে মাংশাসী হয়ে ওঠে সেখানে মানুষের রঙিন কল্পনা প্রজাপতির মতো পাখা মেলে দেয়। কেননা মানুষ-খেকো গাছের কথা আমরা তো শুনেই আসছি। শোনা কথা হলো—আফ্রিকার মানুষ-খেকো গাছ। তারা নাকি সাধারণ গাছ-গাছালির মত ডালপালা খেলিয়ে থাকে, অন্তত বাইরের চেহারাটা নাকি

খুবই নিরীহ। তবে এমনভাবে তারা শিকার ধরবার আশায় ওঁৎ পেতে থাকে যা সহজে বোঝা যায় না ; কিন্তু কাছে এলেই মানুষ থেকে জীবজন্তুকে ঝাপটে ধরে নেয়, তারপর তো আহারের পালা। কিন্তু এ সব হলো রোমাঞ্চকর গল্প-কথা, বিজ্ঞানীরা এমন ধরনের গাছ-গাছালির কোনো নমুনা পান নি।

এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আজও অনেক কিছু অজানা, অদেখা। কে জানে কোন্ দিন হয়ত বিজ্ঞানীরা এমন ধরনের উদ্ভিদের কথা ঘোষণা কোরে আমাদের রোমাঞ্চকর কল্পনার সত্য মূল্য দেবেন !

হাঙর নামে মাছ

অষ্ট্রেলিয়ার বেশ কিছু সমুদ্র-সৈকত আছে যেখানে স্নানার্থীদের জন্যে বিশেষ নিরাপত্তা নেওয়া হয়। বিশেষ কোরে মোটা তারের জাল দিয়ে সমুদ্রের সৈকত থেকে কিছুটা দূর পর্যন্ত ঘেরা থাকে। তা ছাড়া কাছাকাছির



হাঙর

টাওয়ার থেকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। এ সব নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার একটাই কারণ হলো হিংস্র হাঙরদের কবল থেকে স্নানার্থীদের রক্ষা করা।

কেননা খোলা জায়গায় স্নান করা আর হাঙ্গরের পেটে যাওয়া প্রায় একই ব্যাপার।

সমুদ্রের এক ভয়ঙ্কর হিংস্র মাংশাসী প্রাণী হলো হাঙ্গর। আসলে হাঙ্গর হলো এক প্রজাতির মাছ। তিমিকে মাছ বললেও সঠিক অর্থে তিমি মাছের পর্যায়ে পড়ে না। তিমি হলো জলের স্তন্যপায়ী জন্তু।

হাঙ্গরের শরীরটা দেখতে অনেকটা টর্পেডোর মতো। নাকটা গোড়ার দিকে মোটা তারপর ক্রমশ সরু হয়ে গিয়েছে। লেজটা শরীরের অনুপাতে বড়ই বলতে হবে এবং দেখতে ত্রিভুজের মতো। পিঠের ওপরে এবং পেটের দুপাশে দুটো কোরে পাখনা আছে। অনেক মাছের মতো হাঙ্গরের শরীরে কোনো আঁশ নেই, গায়ের চামড়া খস্‌খসে—অনেকটা শিরিশ কাগজের মতো। মুখখানা লম্বাটে, চোয়াল দুটো বেশ শক্তিশালী।

মাছেরা যেমন ফুলকোর সাহায্যে জল টেনে নেয়, হাঙ্গরেরা তা কিন্তু পারে না। সাঁতার দিয়ে চলবার সময় এদের মুখ দিয়ে জল ঢোকে এবং কান্‌কোর মধ্য দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। এই সময় ফুলকোর সাহায্যে এরা শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন টেনে নেয়। এই কারণেই দেখা যায় যে এরা যখন জলের মধ্যে ঘোরাফেরা করে তখন মুখ খুলে রাখে। কেননা মুখ বন্ধ করলেই দম আটকে মরতে হবে।

হাঙ্গরের দাঁত ভয়ানক ধারালো। তাছাড়া মাঝে-মধ্যে নতুন দাঁতও গজায়। সব চেয়ে বড়গোছের হাঙ্গরদের দাঁত লম্বায় প্রায় ৭.৫ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। তা ছাড়া এদের কয়েক পাটি দাঁতও আছে। মজার কথা হলো প্রয়োজন মতো এক পাটির দাঁত নষ্ট হলে, ওপাটির থেকে আসে অর্থাৎ নতুন ভাবে দাঁতও গজাও।

সব থেকে বড় হাঙ্গর লম্বায় হয় ১৮ মিটার অথবা ৬০ ফুট, ওজন কয়েক টনে গিয়ে দাঁড়ায়। বিরাটকায় চেহারার হাঙ্গরদের মস্তিষ্কটি কিন্তু বেশ ছোটো। কিন্তু এদের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। জলের মধ্যে শিকারের গন্ধ এরা বহুদূর থেকে বুঝতে পারে। এমন কি জলের মধ্যে কয়েক ফোঁটা রক্তের গন্ধ এরা অনেক দূর থেকেই তীব্র ঘ্রাণশক্তির জন্যে অনুভব করতে পারে।

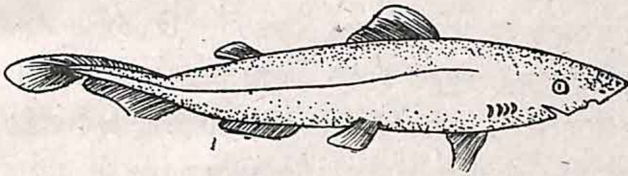
প্রাণী বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, প্রায় ৩০০ ধরনের বিভিন্ন প্রজাতির হাঙ্গর দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ২০ জাতের হাঙ্গর ভীষণ হিংস্র এবং মানুষ দেখলে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে। তবে মানুষ-খেকো হাঙ্গরেরা বেশীর ভাগ সমুদ্রের গভীরেই বসবাস করে। বাদ-বাকী যে কটি খুনে জাতের হাঙ্গর আছে তারা উষ্ণ এলাকায় এবং তীরের কাছাকাছি থাকে। এদের আক্রমণেই ডুবুরী ও ছেলেরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মারা পড়ে।

হাঙ্গর মাত্রেই মাংশাসী। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এদের বাছবিচারের বালাই নেই। দেখা গেছে, জাহাজ থেকে ফেলে দেওয়া খালি টিনের কৌটো এরা গিলে ফেলে। তবে এদের প্রধান খাদ্য হলো নানা জাতের সামুদ্রিক মাছ, নানা ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী ও কচ্ছপ ইত্যাদি। সুযোগ পেলে বাচ্চা তিমিকে ঘায়েল কোরে পরম তৃপ্তিতে আহার করতেও ছাড়ে না।

হাঙ্গরের মাছ খাওয়ার ধরন বেশ মজার। প্রথমে মুখ দিয়ে প্রচুর জল টেনে নিয়ে কানকো দিয়ে বার কোরে দেয়। কিন্তু জলের সঙ্গে যে-সব ছোটো-খাটো মাছ মুখের মধ্যে ঢোকে তারা কিন্তু কানকো দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। এই সব মাছগুলো শেষ পর্যন্ত পেটের মধ্যে চলে যায়। তা ছাড়া হাঙ্গরেরা কখনও মেজাজ নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে আহার্য বস্তু খায় না। সামুদ্রিক জীবজন্তুর দেহ থেকে দাঁত দিয়ে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে টপ্ টপ্ কোরে গালে পোরে। তবে পারকিউপাইন নামে আর এক জাতের মাছ আছে যা হাঙ্গর ভুলেও খায় না। কারণ এই মাছ হাঙ্গরের গলার নালি দিয়ে যাওয়ার সময় ফুলতে আরম্ভ করে এবং শেষ পর্যন্ত গলার নালি বন্ধ হয়ে হাঙ্গরের মৃত্যু হয়। প্রাণী-বিশারদরা হাঙ্গরের খাদ্য-তালিকার খবর দিলেও দৈনিক একটি হাঙ্গরের কতটা খাদ্যের প্রয়োজন হয় তার হিসাব এখনও দিতে পারেন নি তবে এটা জানা গিয়েছে যে, ভালো গোছের শিকার না পেলেও এরা এক মাস না খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু উপবাসের পর তাদের ক্ষিদের ধরন এবং উগ্রতা কতটা হয় তা-ও আমরা জানি না।

হাঙ্গরেরা সামুদ্রিক প্রাণীর ভয়ানক শত্রু সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে হাঙ্গরেরও শত্রুর অভাব নেই। হাঙ্গরের ডিম সামুদ্রিক কাঁকড়া এবং অন্যান্য প্রাণীদের প্রিয় এবং সুস্বাদু খাদ্য। ডলফিন এবং সীল মাছ হলো

হাঙ্গরের পয়লা নম্বর শত্রু। এদের দেখলেই হাঙ্গর প্রাণভয়ে পালায়। ডলফিন বা সীল মাছ হাঙ্গর দেখলেই তীরবেগে ছুটে এসে এদের পেটে এমন জোরে ধাক্কা মারে যে তাতে হাঙ্গরের পেট ফুটি-ফাটা হয়ে যায়।



হাঙ্গর

বহু জাতের হাঙ্গরেরা পৃথিবীর সব মহাসাগরেই ঘুরে-ফিরে বেড়ায়। তবে এদের মধ্যে কিছু কিছু প্রজাতির হাঙ্গর ক্রান্তীয় উষ্ণ অঞ্চলের জলে থাকতে ভালোবাসে। তবে এক ধরনের হাঙ্গর আছে যারা মেরু অঞ্চলের বরফ জলে থাকে। তা ছাড়া কিছু কিছু প্রজাতির হাঙ্গর আছে যারা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পাড়ি দেয়।

তবে যে-সব খুনে হাঙ্গর আছে তারা বিভিন্ন জাতের—নামেও আলাদা আলাদা। বাঘা-হাঙ্গর, নীল-হাঙ্গর, তিমি-হাঙ্গর, হাতুড়ে-মাথা-হাঙ্গর, বড়-সাদা-হাঙ্গর, সাদা-মাথা-হাঙ্গর, লেবু-হাঙ্গর বিশেষ উল্লেখযোগ্য অর্থাৎ খুনী হিসাবে এদের নাম-ডাক আছে। তবে এদের মধ্যে তিমি-হাঙ্গর সব চেয়ে বড় জাতের। এরা লম্বায় প্রায় ৬০ ফুট বা ১ মিটারের মত হয়। কিন্তু এ সব খুনীদের মধ্যে পয়লা নম্বরের খুনী হলো হাতুড়ে-মাথা হাঙ্গর ও সাদা-মাথা হাঙ্গর।

জীববিজ্ঞানীদের মতে এসব ভয়ানক হিংস্র ও খুনী হাঙ্গররা হলো মাছ। মৎস্য-প্রিয় মানুষের কাছে হাঙ্গরের খুনী চেহারাটা তুলে ধরলে কি প্রতিক্রিয়া হবে জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি মানুষের চেয়ে বড় খাদক হাঙ্গর হতে পারে নি, পারবেও না।

তবে মানুষ বুদ্ধিমান জীব। ডলফিন আর সীল মাছ ছাড়া হাঙ্গর সমুদ্রের আতঙ্ক।

রুশ দেশের এক রূপকথায় আছে যে, জার বেরেনডি জানতে পেরেছিলেন আলো-দেওয়া পতঙ্গেরা পৃথিবীর বুকে আলো জ্বেলে দেয়। জার ছিলেন বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী। তাঁর ইচ্ছে হয়েছিলো এ ধরনের বিস্ময়কর এবং রোমাঞ্চকর আলো-দেওয়া পতঙ্গ দিয়ে তিনি তাঁর প্রাসাদকে আলোতে ভরিয়ে দেবেন। অবশ্য ইচ্ছেটা কেবল তাঁর একার ছিলো না। প্রাচীন-কালের অনেকেই এ সব পতঙ্গদের খবর রাখতেন, তাই এ সব আলো-দেওয়া পতঙ্গ ধরে এনে তাঁরা জীবন্ত আলো দিয়ে রাতের গৃহ আলোকিত করতেন।



আলো-দেওয়া ব্যাঙের ছাতা

ব্রাজিলের ক্রান্তীয় বনাঞ্চলে এক ধরনের ব্যাঙের ছাতা হয়। ঐ ছাতা বা টুপীর মত মাথাটা বেশ জ্বলজ্বলে অর্থাৎ টুপী থেকে আলোর রশ্মি অন্ধকারের

বুকে মোহিনী রূপ ধরে। ব্রাজিলের গ্রামবাসীরা এই আলোকে খুব পছন্দ করে এবং কাজেও লাগায়। অন্ধকারের বুক চিরে এই আলো যখন স্নিগ্ধ কিরণ ছড়ায় তখন গ্রামবাসীরা ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে পথ দেখতে পায়, নিশানা ঠিক কোরে নেয় গন্তব্য স্থানের।

সমুদ্রে এক ধরনের আলো-ছড়ানো মাছ আছে যাদের বলে ক্রেফিশ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানী সৈন্যরা এই মাছ ব্যবহার করতো। ক্রেফিস কোনো আলো দেয় না, কিন্তু যে মুহূর্তে তাদের গা ভিজিয়ে দেওয়া হয় সেই মূহূর্তে তারা লণ্ঠনের মতো আলো দেয়। বিশেষ কোরে জাপানী অফিসাররা ছোটো ছোটো বাক্সে এই ক্রেফিশ রাখতেন। নিস্তব্ধ রাতে ডুবোজাহাজে বসে, কিম্বা ঘন জঙ্গলের মিশকালো অন্ধকারে চলতে চলতে অথবা পাথুরে সড়কের ওপর পা ফেলে যেতে যেতে মাঝে মাঝে যুদ্ধের মানচিত্র দেখতে হতো, কখনও আবার চিঠি লিখে গন্তব্যস্থানে পাঠাতে হতো। কিন্তু কোনো ধরনের বৈদ্যুতিক আলো কিম্বা দেশ্‌লাই জ্বেলে তার আলো ব্যবহার করা ছিলো নিষিদ্ধ। কেননা শত্রুপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ হতে পারে। কিন্তু ক্রেফিশের আলোর ধরন এমনই যে এতে এ ধরনের কাজ চলত স্বচ্ছন্দে ; তবে যিনি আলো ব্যবহার করছেন তাকে বোঝা যেত না।

কিছু পতঙ্গেরা এমন ধরনের মিটিমিটি আলো দেয় যাতে কিন্তু আমাদের ঘর-দোর আলো পায় শুধু যে জোনাকীপোকা তা নয়, এমন ধরনের পতঙ্গ আরও আছে। এ এক ধরনের "ব্যাক্টেরিয়াল ল্যাম্প"। এ সব ল্যাম্পের নক্সা খুবই সরল, তবে বেশ রোমাঞ্চকর। একটা কাঁচের বাল্বে কিছুটা সমুদ্রের জল নিয়ে যদি এই ধরনের আণুবীক্ষণিক পোকাদের তাতে ছেড়ে দেওয়া হয় তা হলে সেই বাল্ব থেকে মোটামুটি বেশ আলো পাওয়া যাবে।

তবে এ কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে একটি অতি ক্ষুদ্র পোকার আলো দেবার ক্ষমতা নেহাতই নগণ্য। এক ক্যাণ্ডেল শক্তির আলো পেতে একটি বাল্বের মধ্যে কমপক্ষে ৫০০,০০০, ০০০, ০০০, ০০০ গুলো ছোটো ছোটো পোকাদের রাখতে হবে। তবে এই অতি-ছোটো-ছোটো পোকাদের দিয়ে ঝল্‌মলে আলো পাওয়া যেতে পারে। এই ধরনের আলো দিয়ে

১৯৩৫ সালে প্যারিসে "ওসানোগ্রাফিক ইনস্‌টিট্যুট"-এ আন্তর্জাতিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিলো; ব্যাপারটি আশ্চর্যের হলেও সত্যি ঘটনা।

আমরা বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে দাঁড়িয়ে আণবিক শক্তির মাহাত্ম্য শুনছি। সুতরাং এ কালে কি আমরা ভাবতে পারি যে এ ধরনের জৈব-আলোর সাহায্যে আমরা রাতের আঁধার দূর করতে পারবো! বিজ্ঞানীরা বলছেন, এমনটা সম্ভব হওয়া মোটেই অবিশ্বাস্য নয়। বর্তমানে তো সমুদ্রের গভীর অতলে মানুষ নামছে, নানা ধরনের গবেষণাও চলছে সমুদ্র সম্পর্কে; সমুদ্রের তলায় কোঠাবাড়ি বানিয়ে মানুষ বেশ ভালভাবেই বাঁচতে পারবে, দীর্ঘক্ষণ ধরে কাজকর্মও করতে পারবে। সমুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গের আলোয় ঝলমল্‌ করবে 'সাগর-তলার-ঘরবাড়ী'। ব্যাপারটি খুবই মন-মাতানো, খুবই রোমাঞ্চকর। কিন্তু বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের গবেষণা কোরে বলছেন ভবিষ্যতে মানুষ স্বচ্ছন্দে ঘর বাঁধবে সাগরের তলায়।

আসলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে রাসায়নিক শক্তিকে কি ভাবে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। জৈব-আলো জ্বালাতে যে-ধরনের বাল্ব ব্যবহার করা হবে তা কিন্তু আমাদের ব্যবহার্য বাল্বগুলোর চেয়ে অর্থের দিকে অনেক সুবিধাজনক। জৈব-উষ্ণতার সম্পূর্ণটাই আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে, যেখানে আমাদের ব্যবহার্য বাল্বে শতকরা ১২ ভাগ শক্তি উষ্ণতা থেকে আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে ব্যয় হয়ে যায়। বলতে পারা যায় ১২% শক্তি কাজে লাগানো যায় না। তাছাড়া দূর-দূরান্তে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্যে বৈদ্যুতিক কেবল-এর প্রয়োজন দেখা দেবে না। মাটির তলা দিয়ে লাইন কিম্বা 'ওভার হেড' লাইন টেনে টেনে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থার চেয়ে এই জৈব-আলো যে অনেক ফলপ্রদ হবে সে ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা আমাদের আশ্বস্ত করছেন। রসায়নের ক্রমবর্ধমান উন্নতি হয়েছে এবং অবিশ্বাস্য গতিতে রসায়নের বিপুল কর্মক্ষেত্র বাড়ছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে আমরা জৈব-আলোর সাহায্যে ঘর-দোর, রাস্তা-ঘাট খেলার-মাঠ, সিনেমা-থিয়েটার ইত্যাদি ঝলমলে কোরে তুলতে পারবো।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, ১৯৭১ সালে একটি আমেরিকান কোম্পানী (The American Cynamid Company) জৈব আলো সৃষ্টি করতে

সক্ষম হয়েছিলো। কাঁচের ক্যাপসুলের মধ্যে নানা ধরনের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে ভরে, তারপর এঁটে দিয়ে একটা প্ল্যাসটিকের ফাঁপা নলের ভেতর ক্যাপসুলগুলো ভরে দেওয়া হয়। প্লাসটিকের ঐ দণ্ডটি দুমড়ে দিলেই ক্যাপসুলগুলো ভেঙে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় রাসায়নিক বিক্রিয়া ; এর ফলে দেখা দেয় জৈব আলো।

আসলে কিন্তু জোনাকী পোকাদের মিটমিটে আলো দেওয়া আমাদের চোখের আলোকে পরিচ্ছন্ন করেছে বলেই আমরা জৈব আলোর কথা ভাবছি।

সমুদ্রকন্যার কাহিনী

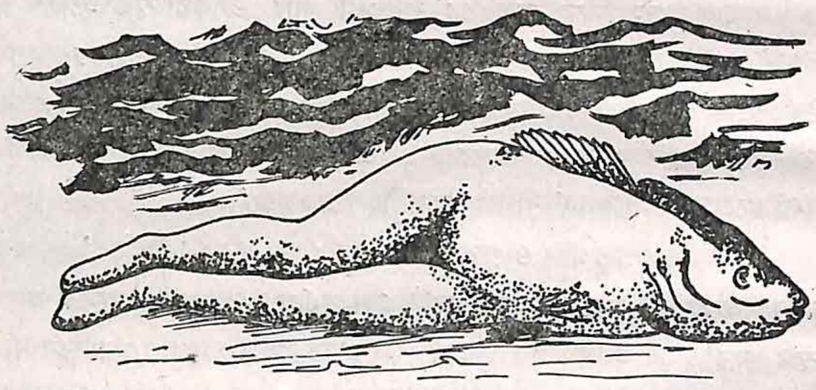
সমুদ্রকন্যাকে নিয়ে কত যে রূপকথা আর উপকথা সৃষ্টি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অবশ্য গল্পগুলো যেমন সুখপাঠ্য তেমনি জীবজগতের অপরূপ বৈচিত্র্যের কথা কল্পনার রঙে রঙীন হয়ে শুধু যে শিশুদের মন-হরণ করেছে তা নয়, বয়স্কদের মনও জয় করেছে। এই 'সমুদ্র-কন্যা'কে কখনও কখনও বলা হয়েছে 'মৎস্যকন্যা' বা পাতালপুরীর 'রাজকন্যা'।

এক সময় পোর্তুগীজ ও স্পেনদেশের নাবিকরা বলত 'স্ত্রী-মাছ'। এ সব বর্ণনা অনুযায়ী আদর্শ সমুদ্রকন্যার একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি আমরা অনেক আগেই সৃষ্টি করেছি। সমুদ্রকন্যার উর্ধাঙ্গ মেয়েদের মতো এবং কোমরের নিচে থেকে ঠিক মাছের ধরনের। অনেক উপকথায় দেখা যায় এরা নাকি মানুষের মতো হাসে-কাঁদে, এদের স্নেহ, মায়া, মমতা অপরিসীম। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে এরা নাকি আদর্শ স্ত্রী হিসাবে বসবাস করতে চায়। এমন সব উপকথায় 'সমুদ্র কন্যার' সজীব পরিচিতি।

জীববিজ্ঞানীরা বলছেন সমুদ্রকন্যা হলো সামুদ্রিক প্রাণী। এদের উর্ধাংশের কিছুটা মানুষের আদল আছে, তবে নিচের অংশটা মাছের মতো। এরা হলো সমুদ্রগাভী (sea cow)। তিমি, ডলফিন, সমুদ্রসিংহ যেমন স্তন্যপায়ী প্রাণী, সমুদ্রগাভীও তেমনি স্তন্যপায়ী। এই সব সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পূর্ব ইতিহাস শোনার মতো।

এই সব সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পূর্বপুরুষেরা ছিলো স্থলচর। কিন্তু

কোনো এক সময়ে জীবন-সংগ্রামের তাগিদে এরা এক সময় হয়ে যায় উভচর। তারপরে এরা জলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী হয়ে যায়। তবে সকল জলচর প্রাণীদের পূর্বপুরুষ এক নয়। যেমন, সমুদ্রসিংহ, সীল ও অন্যান্যরা এক সময় ছিলো মাংশাসী। তিমিদের পূর্বপুরুষ ছিলো অন্য গোত্রের। সমুদ্রগাভীর পূর্বপুরুষও আলাদা এবং এরা ছিলো তৃণভোজী। অনেক জীববিজ্ঞানী মনে করেন আফ্রিকার হাইর‍্যাক্স, হাতী ও সমুদ্রগাভীর পূর্বপুরুষ ছিলো এক। খাদ্য আর বাসস্থানের অন্বেষণে কোনো এক সময়ে এদের কোনো এক শাখা জলাশয়ে চরে বেড়াতো। অভিযোজনের ফলে হাজার হাজার বছর পার হতে হতে এদের দেহের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সেই পরিবর্তনের জের হলো সমুদ্রগাভী।



সমুদ্রগাভী

সমুদ্রগাভী, যাদের আমরা উপকথায় বলেছি 'সমুদ্রকন্যা', 'মৎস্যকন্যা' কিম্বা পাতালপুরীর 'রাজকন্যা', তারা আসলে সমুদ্রের স্তন্যপায়ী জীব। সিরেনিয়া (sirenia) বর্গের দুটি গণ-এর মধ্যে একটিকে বলে ডুগং (dugong), অন্যটিকে বলে ম্যানাটি (manatee) সাধারণত এদের দিনের বেলায় দেখা যায় না, তবে চাঁদিনী রাতে সাগরের বুকে এরা যখন উঁকি-ঝুঁকি মারে তখন সেই ডুগং ও ম্যানাটিদের 'সমুদ্রকন্যা' বলে মনে হয়।

ডুগংরা থাকে ভারত মহাসাগরে। তাছাড়া ভারতের কচ্ছ প্রণালী, মালাবার উপকূল, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আশেপাশে ও শ্রীলঙ্কার উত্তর-পশ্চিম

উপকূলে এক সময়ে এদের প্রচুর সংখ্যায় দেখা যেতো। তবে লোহিত সাগর, অষ্ট্রেলিয়া ও ফরমোজা উপকূল থেকে যে-সব প্রজাতির সমুদ্রগাভী দেখতে পাওয়া যায় তাদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যদিও বলা হয় হেলিকোর (Helicore), আসলে তারা ডুগং-এর পর্যায়ে পড়ে।

এক একটি পূর্ণ বয়স্ক ডুগং লম্বায় ১০ থেকে ১২ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে ; দেহের ঘের হয় ৬ থেকে ৮ ফুটের মতো। এদের ওজন দাঁড়ায় কমপক্ষে ১ টনের মতো। ডুগংদের দেহের আদল অনেকটা সীলের মতো বা ছোটো-খাটো তিমির মতো। এদের দেহের আশ-পাশ প্রায় গোলীয় ; এদের ঘাড় নেই, পেটের তলাটা চ্যাপ্টা, কাঁধ নেই—তাই ধড়ের ওপরই মুণ্ডটি থাকে। লেজ মাছের মতো হলেও তা পুরু ত্বক দিয়ে তৈরী। সাঁতার দেবার জন্মে উর্ধবাহু চওড়া-প্যাডেল-এ (paddle) রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। তলার দিককার কোনো পা নেই। স্ত্রী-ডুগং-এর বাহুর নিচের দিকে থাকে স্তনযুগল। এদের দেহের তুলনায় মাথাটি ছোটো। নিচের ঠোঁটের চেয়ে ওপরের ঠোঁট বড় হওয়ার জন্মে অনেকটা হাতির শুঁড়ের মতো দেখায়।

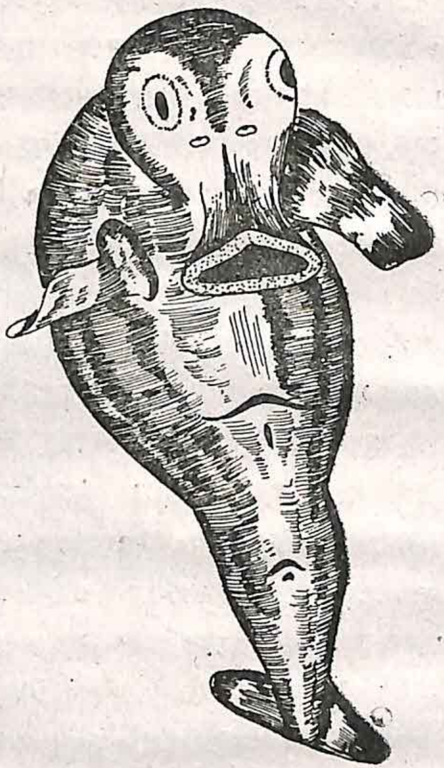
ডুগং-এর সারা দেহে ছোটো ছোটো লোমে ভর্তি। বাচ্চাদের উর্ধ চোয়ালে থাকে ৪টি, আর নিচের চোয়ালে থাকে ৮টি কোরে কৃন্তক দাঁত (incisor) এবং পেষক দাঁত (molar) থাকে ৫টি কোরে। অবশ্য পূর্ণাঙ্গ ডুগং-এর ওপরের চোয়ালে ৩টি ও নিচের চোয়ালে ২টি কৃন্তক দাঁত থাকে। পুরুষ-ডুগং-এর ওপরের কৃন্তক দাঁত ওপরের ঠোঁট ঠেলে বেরিয়ে আসে বলে 'গজদন্তে'র মত দেখায়। বাঁকা চাঁদের মতো নাসারন্ধ্র থাকে মাথার ঠিক ওপরে। এই কারণে এরা মাথা তুললেই বাতাস নিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায়। এদের ফুসফুস আছে। চোখগুলো ছোটো ছোটো ; কানের অস্তিত্ব বোঝা যায় দুপাশের দুটো গোলাকৃতি ছিদ্র দেখে। গায়ের রং ধূসর বা পিঙ্গল। কিন্তু পেটের তলার মাংসের রং হলো লাল।

স্ত্রী-ডুগং একটি কোরেই বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চাকে স্তন্যপান করায়, আর অত্যন্ত স্নেহ দিয়ে তার পরিচর্যা করে। জেলেদের জালে ধরা পড়লে এদের চক্ষু-গ্রন্থি দিয়ে টপ্ টপ্ কোরে জল গড়িয়ে পড়ে। কারণটা কি তা সঠিক কোরে বলা যায় না। মনে হয় আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ

পাবার জন্য হয়ত ব্যাকুল মিনতি। শ্রীলঙ্কার কলম্বো চিড়িয়াখানায় একটি ডুগংকে ধরে রাখা হয়েছিলো। কিন্তু যে ক'মাস সেটি বেঁচে ছিল ততদিন সে চোখের জল ফেলেছে। মালয়ের অধিবাসীদের অভিমত হলো এটা ভালবাসার প্রতীক চিহ্ন। স্ত্রী-পুরুষের মিলনের সময় কিম্বা বাচ্চাকে পরিচর্যার সময় এদের চোখ দিয়ে এমন ধরনের জল গড়িয়ে পড়ে। ৭০ থেকে ৮০ বছর পর্যন্ত এরা বেঁচে থাকে।



ম্যানাটি



ডুগং

'ম্যানাটি'দের সাধারণত উত্তর আমেরিকার নদীগুলিতে, আট্‌লান্টিক মহাসাগরে, মধ্য আমেরিকা, মেক্সিকো ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নদীগুলোতে ও আফ্রিকার উপকূল অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়।

ম্যানাটিরা সাধারণত ৭ ফুট থেকে ১৩ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এদের পেষক দাঁতের ওপর এনামেল করা থাকে। ওপর ও নিচের চোয়ালে ২০টা করে দাঁত থাকে। এদের ঘাড়ে ৬টি কোরে কশেরুকা থাকে আর প্যাডেলের

আঙ্গুলে নখও আছে। ম্যানেটিদের লেজ মোটামুটি গোল। অন্যান্য আচরণের দিক থেকে ম্যানেটির সঙ্গে ডুগং-এর যথেষ্ট মিল আছে।

ডুগং বা ম্যানেটি দারুন ভীতু। এরা সাধারণত সমুদ্রের অগভীর জলে উদ্ভিদের জন্যে ঘুরে বেড়ায়। কেননা উদ্ভিদই হলো এদের প্রধান খাদ্য। তাছাড়া বিশ্রাম নেবার সময় জলের তলায় উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে। মাঝে-মধ্যে প্যাডেলের সাহায্যে তীরেও উঠে আসে। ম্যানেটিরা যেমন অগভীর জলে থাকতে ভালোবাসে, ডুগংরা তেমনি ভালোবাসে গভীর সমুদ্রে থাকতে।

ম্যানেটিদের চেয়ে ডুগংদের দৈহিক আদল মানুষের মত। এই ডুগং দ্রুত পলায়নে অক্ষম বলেই এরা তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে যায়। যে-সব জায়গায় ডুগংরা থাকে সেখানকার জেলেরা এদের ধরে, কেননা এদের মাংস নাকি সুখপাচ্য। বিশেষ কোরে ভারতের মানা প্রণালীতে এক সময় এদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। কিন্তু শিকারের ফলে এরা আজ প্রায় অবলুপ্ত। মানুষ লোভের বশে এদের ধরে, মারে। তাছাড়া এদের চর্বি থেকে যে তেল পাওয়া যায় তার পরিমাণ লোভনীয়। একটি পূর্ণাঙ্গ ডুগং থেকে ১০ থেকে ১২ গ্যালন তেল পাওয়া যায়। এই তেল জ্বালানী, সাবান প্রভৃতি নানা কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এই ডুগংরাই মানুষকে আকর্ষণ কোরে আসছে বহুকাল থেকে। এরা যখন শিরদাঁড়ার ওপর ভর দিয়ে জলের ওপর উর্ধাঙ্গ তুলে সোজা হয়ে ওঠবার চেষ্টা করে তখন পেটের লাল কিম্বা পিঙ্গল বর্ণ সূর্যের আলো পড়ে ঝলমল কোরে ওঠে। দিনেই হোক কিম্বা রাতেই হোক ডুগংরা যখন সমুদ্রের ওপর সোজা হয়ে উঠতে চায় তখনই মাঝে-মধ্যে জাহাজের নাবিকদের কিম্বা যাত্রীদের চোখে পড়ে। তখনই এদের 'সমুদ্রকন্যা' বলে ভ্রম হয়। এই ভাবেই ডুগংরা হয়েছে 'সমুদ্রকন্যা'—বিশ্ব সাহিত্যের রূপকথার আসরে তারা অমর হয়ে আছে।

মাকড়শা আর বোলতার সম্পর্ক

পৃথিবীতে প্রত্যেকটি জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গের নিজ নিজ খাদ্য আছে, এবং যে যার নিজের খাদ্য বেছেও নেয়। প্রকৃতির নিপুণ গৃহিণীপনার সামঞ্জস্য বিধান যে কতখানি এটি হলো তার অন্যতম উদাহরণ। অবশ্য

Acc. No. - 14811

জীবন-সংগ্রামে জয়ী হতে গেলে, জীবনের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে গেলে প্রত্যেককেই তার নিজ নিজ খাদ্য আহরণ কোরে নিতে হবে।

এমন সব কীট-পতঙ্গ দেখা যায় যারা 'লার্ভা' অবস্থায় থাকে মাংশাসী। আর আশ্চর্যের ঘটনা হলো যে, এই সব লার্ভাদের নিরামিষভোজী মায়েরা তাদের নিতান্ত বাচ্চাদের জন্য আমিষ খাদ্য জোগায়। মায়েরা যদি লার্ভাদের জন্য উপযুক্ত খাদ্য এবং সঠিক খাদ্য সরবরাহ করতে না পারে তাহলে লার্ভাগুলো কিছুতেই বাঁচবে না। কিন্তু মায়েরা কখনও এ ধরনের খাদ্য খায় না। এই কারণের জন্যেই দেখা যায় যে টারানটুলা মাকড়শা ও বোলতায় (যারা মাটিতে গর্ত করে) আশ্চর্য রকমের সম্পর্ক। অবশ্য এ ধরনের সম্পর্ককে সঠিক অর্থে মিতালী বলা যাবে না, কেননা সম্পর্কটা খাদ্য-খাদকের।

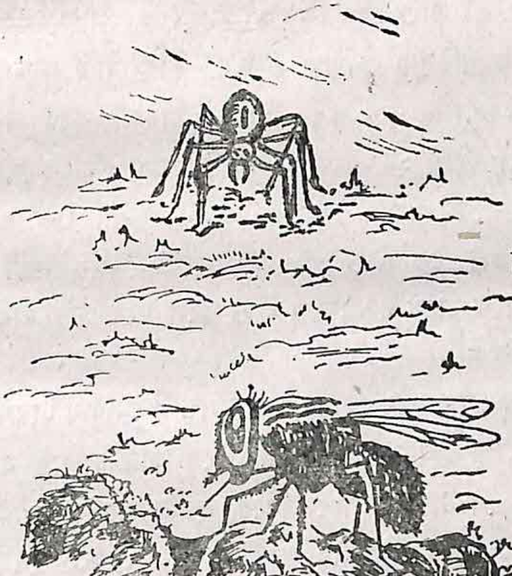
টারানটুলা মাকড়শার বাসভূমি হলো ক্রান্তীয় অঞ্চলে। এক সময়ে মানুষ বিশ্বাস করতো যে টারানটুলার বিষে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। ইটালীতে একটি জায়গা আছে যার নাম টারানটো, এবং সেই থেকে এ ধরনের মাকড়শাদের নাম হয়েছে টারানটুলা মাকড়শা। তাছাড়া এক ধরনের প্রচলিত বিশ্বাস ছিলো যে, এই মাকড়শা যাদের কামড়াবে তারা যদি নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তবেই তারা দংশন-বিষ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।

টারানটুলা মাকড়শার সম্পর্কে যে-ভীতি তার যথেষ্ট কারণও আছে। কেননা তাদের কামড়ে পোকামাকড় তো বটেই এমন কি ছোটো-খাটো স্তন্যপায়ী জীবদের মৃত্যু বরণ করতে হয়। টারানটুলা মাকড়শারা মাটির ভেতর প্রায় গোলাকার গর্ত কোরে বসবাস করে। সন্ধ্যে হলেই গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়ে, ফেরে সেই ভোরের আলোয়। পরিণত বয়স্ক পুরুষ মাকড়শা রাতের অন্ধকারে অভিসারে বেরোয়। প্রেমাভিসারের পরিণতি হলে, পুরুষ মাকড়শাকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দেহ রাখতে হয়। কিন্তু স্ত্রী মাকড়শা বহাল তবিয়তে বছরের পর বছর কাটায়। স্ত্রী মাকড়শা এক সঙ্গে ডিম পাড়ে ২০০ থেকে ৪০০টির মতো। কিন্তু ডিমগুলোকে রক্ষা করার ব্যাপারে

তাদের কোনো সংবেদনশীল মন থাকে না। শুধু লালা দিয়ে সুতোর বেড়া করে দিয়েই স্ত্রী মাকড়শা পালায়।

বোলতা যতই মারাত্মক হোক্ না কেন তাদের দেখতে কিন্তু বেশ। কালোয়-হলদেয় ডোরা-কাটা দাগে তাদের দেহের চেক্‌নাই। ভ্রমরের মত বোলতারা ফুলের পরাগ খেতে ভালোবাসে বলেই ফুলের ওপর তাদের দেখা যায়। তবে রেগে-যাওয়া বোলতাদের গা থেকে এক ধরনের ঝাঁঝালো গন্ধ বেরোয়। মৌমাছির হুলের জ্বালা বেদনাদায়ক নিশ্চয়ই কিন্তু বোলতার হুলের শুধু জ্বালা নেই, দংশন এলাকাটি বেশ ফুলেও ওঠে।

এ হেন ক্ষুদে শয়তানরা কিন্তু বেশীদিন বাঁচে না। পূর্ণবয়স্ক বোলতার আয়ু মাত্র কয়েক মাসের জন্যে। তবে বোলতাদের ছুটো শ্রেণী। এক ধরনের বোলতারা বেশ সামাজিক, অর্থাৎ স্বজন নিয়ে জীবনযাত্রা চালায়, আর অন্য



স্ত্রী-বোলতা মাকড়শার জন্যে কবর খুঁড়ছে

শ্রেণীরা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতেই ভালোবাসে। এই নিঃসঙ্গ জীবন-যাপনকারী বোলতাদের গায়ের রঙের বাহার মনোমুগ্ধকর। লাল, নীল, ঘন সবুজ তাদের গায়ের রং।

বিশেষ কোরে নিঃসঙ্গ বোলতাদের 'লার্ভাগুলো' পরাশ্রিতজীবী। সোজা

কথা হলো লার্ভারা কীট-পতঙ্গের দেহ থেকেই তাদের খাদ্য সংগ্রহ করে। এই ধরনের স্ত্রী-বোলতাদের গর্ভাশয়ে ডিমগুলো যখন পরিণত হয় তখনই তারা মাকড়শার অনুসন্ধানে বেরোয়। রোদ-ঝল্‌মলে বিকেলে মাটি ঘেঁসে এই স্ত্রী বোলতা তার সঠিক শিকার খুঁজতে থাকে। যতক্ষণ না তারা তাদের শিকার পায় ততক্ষণ পর্যন্ত চলে দুরন্ত অন্বেষণ।

গর্ভবতী স্ত্রী বোলতা তার শিকার খুঁজে তাকে ভালোভাবে খুঁটিয়ে জেনে নেয় যে, সে সঠিক জিনিস পেয়েছে কি না। যদি নির্বাচন ঠিক হয়, তখন স্ত্রী-বোলতাটি হামাগুড়ি দিয়ে মাকড়শার পেটের তলা দিয়ে চলে গিয়ে তার গা বেয়ে ঘুরে নেয়। কিন্তু স্ত্রী-বোলতাটির এমনই আচরণ হয় যাতে টারানটুলার কাছ থেকে কোনো আক্রমণই আসে না। ব্যাপারটা সত্যিই বিস্ময়কর। এই অবস্থায় টারানটুলা তখন ধীরে ধীরে আট পায়ে ভালোভাবে দাঁড়িয়ে ওঠে এবং এই ভাবে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েও থাকে। এই অবস্থায় স্ত্রী বোলতা তার পরিপূর্ণ সুযোগ নেয়। তাই মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার এগিয়ে গিয়ে মাকড়শাটির জন্যে কবর খোঁড়ার ব্যবস্থা করে স্ত্রী-বোলতাটি। চোয়াল আর পা দিয়ে ২০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার পরিধির যে গর্তটি খোঁড়ে তা আসলে মাকড়শাটির কবর। অবশ্য মাকড়শাটি তা জানতে বা বুঝতে পারে না। কাজটি খুব দ্রুত গতিতেই সম্পন্ন কোরে ফেলে। তবে গর্ত খোঁড়বার সময় মাঝে মাঝে গর্ত থেকে মাথা তুলে দেখে নেয় মাকড়শাটি ঠিক জায়গায় আছে কি না?

কবর খোঁড়ার কাজ শেষ কোরে স্ত্রী-বোলতাটি আবার টারানটুলার কাছে ফিরে যায় এবং শুঁড় (অ্যানটেনা) দিয়ে তাকে আর একবার যাচাই কোরে নেয়। তারপর পেটটাকে বেঁকিয়ে দিয়ে, হুলটা বার কোরে নিয়ে, খুঁজতে থাকে দেহের যে অংশের সঙ্গে তার পা-টি সংযুক্ত হয়েছে সেই জায়গাটি। কেননা এখানকার নরম ঝিল্লীই হলো একমাত্র জায়গা যেখানে হুল ফোটালে টারানটুলাকে ঘায়েল করা যাবে। এ অবস্থায় মাকড়শাটি মাটির ওপর একটু সরে যেতে থাকলেও স্ত্রী-বোলতাটি তার পাখনার ঝাপট মেরে ঐ নির্দিষ্ট স্থানটি খুঁজতে থাকে। মজার ব্যাপার হলো যে, প্রথম অবস্থায় মাকড়শাটি নিজেকে রক্ষা করার জন্যে বিশেষ কোনো উদ্যোগই নেয় না।

স্ত্রী-বোলতার আক্রমণ কিন্তু ক্রমশঃ ক্রমশঃ আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে চোয়াল দিয়ে স্ত্রী-বোলতাটি মাকড়শার পা সাপ্‌টে ধরে। তখনই যেন মাকড়শাটির চৈতন্য উদয় হয়। বুঝতে পারে আসন্ন বিপদের সংকেত। তাই আত্মরক্ষার জন্যে তখন সে যে-চেষ্টা করে তা ব্যর্থ হয়। তখনই শুরু হয় দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মাটিতে গড়াগড়ি, ওলট-পালট খাওয়া। কিন্তু স্ত্রী-বোলতা তখন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে এবং টারানটুলাকে চূড়ান্ত আঘাত হানবার জায়গাটি বেছে নেয় এবং তীক্ষ্ণ হুল ফুটিয়ে দিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বিষ ঢেলে দেয়। টারানটুলা সঙ্গে সঙ্গে অসাড় হয়ে যায়। পায়ের ছটফটানি থেমে যায়, হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌-ধুকুনি বন্ধ হয়।

বিজয়িনী স্ত্রী-বোতলটি তখন নিজের গা-পা পরিষ্কার কোরে নেয়। তাছাড়া টারানটুলার ক্ষতস্থান থেকে যে রক্ত চুঁইয়ে পড়তে থাকে তা চুষে-চুষে খায়। এসব কাজের পাট চুকলে স্ত্রী-বোলতাটি চোয়ালের জোরে টারানটুলার ঠ্যাঙ ধরে টানতে টানতে 'কবরে' নিয়ে যায়।

প্রয়োজনীয় কাজ সারা হয়ে গেলে স্ত্রী-বোলতা ডিম পাড়ে। অবশ্য কখনও ডিম পাড়ে এক সঙ্গে, আবার কখনও দু'তিন দিন ধরে ডিম পাড়ে। ডিমগুলোকে ঠিক টারানটুলার পেটের সঙ্গে এক ধরনের আঠালো রস ঝরিয়ে সেঁটে দেয়। তারপর নিজে কবর থেকে বেরিয়ে পড়ে ; চোয়ালের সাহায্যে মাটি এনে এনে কবর-স্থানটিকে এমনভাবে ঢেকে দেয় যাতে বাইরে থেকে কেউ-ই বুঝতে না পারে কি হয়েছে বা কি আছে এখানে। কাজ সারা হলেই আবার উড়ে যাবার পালা।

লার্ভাগুলো তাদের উপযুক্ত খাদ্য পেতে পেতে বড় হয় এবং এক সময় লার্ভা ফুটে বোলতা বেরিয়ে যায়।

খাদ্যচক্রের কি কৌশল! বোলতায় আর টারানটুলায় কোনো মিতালী নেই, আছে শুধু জীবনসংগ্রামের নিপুণ বিদ্যা!

তৃতীয় নেত্রের অস্তিত্ব

কথাটা অবিশ্বাস্য শোনালেও এমন বেশ কিছু প্রাণী আছে যাদের একশটা পর্যন্ত চোখ আছে। জীববিজ্ঞানীরা তো বলেছেন, চোখ হলো সব থেকে

সক্রিয় ও সাহায্যকারী অঙ্গ এবং যার কার্যকারিতা মোটেই উপেক্ষা করার নয়। আমরা তো বলি 'চক্ষু-রত্ন'। তাছাড়া আমরা এটাও জানি যে আমাদের জ্ঞান আহরণের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় হলো চক্ষু।

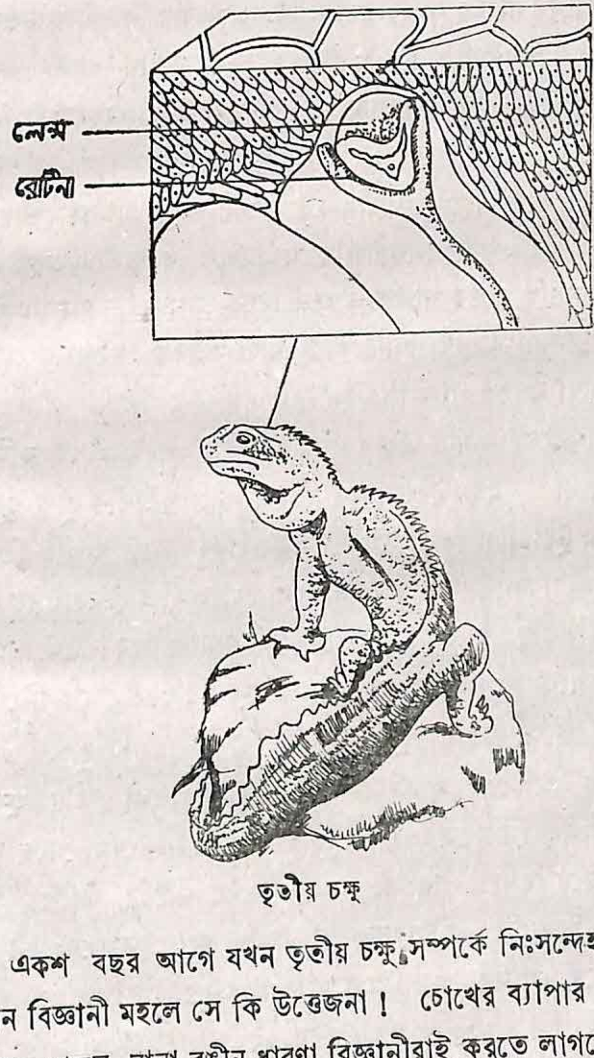
প্রশ্নটা যদি তোলা হয় যে, কটা চক্ষু থাকলে সব থেকে ভালো হয়? তা হলে ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবতে হবে বুঝতে হবে। কেননা চক্ষুর সংখ্যার ওপরই নির্ভর করে প্রাণীর শ্রেষ্ঠত্ব এবং জীবনযাত্রার পদ্ধতি। বর্তমানে এমন বেশ কিছু প্রাণী আছে যাদের এক সময় ভালো চোখ ছিলো, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে অন্ধকারে থাকতে থাকতে সেই চোখ অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। মেক্সিকোর গুহায় থাকা মাছ হলো এর সার্থক উদাহরণ।

জীববিজ্ঞানীরা বলছেন, এ ব্যাপারে প্রকৃতির নিপুণ গৃহিণীপনার ওপর নির্ভর করাই উচিত কাজ। জীবজগতের বিবর্তনের পথে প্রতিটি প্রজাতি নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে যার যটা চোখের প্রয়োজন ছিলো প্রকৃতি তাকে ঠিক ততটাই চোখ দিয়েছে। বিশেষ কোরে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মানুষ হলো সব থেকে পরিণত প্রাণী। মানুষের জটিল দেহ-গঠন, উন্নত মস্তিষ্ক, ধারালো জ্বল্‌জ্বলে চক্ষু তো আছেই। কিন্তু জীববিজ্ঞানীদের অভিমত হলো মানুষের চক্ষু হলো তিনটি। সংখ্যাটি কিন্তু ছাপার ভুল নয়, মানুষের আসলে তিনটিই চক্ষু আছে।

মাছ, উভচর প্রাণী, সরীসৃপ পাখী, এবং স্তন্যপায়ীদের প্রত্যেকের তিনটি কোরে চক্ষু আছে। আমরা কথাটা মনেই রাখতে পারি না, তাই মনে করি এসব প্রাণীদের দু'টি কোরে চক্ষু। এর আসল কারণ হলো, তৃতীয় চক্ষুটি রয়েছে মস্তিষ্কের মধ্যে এবং বাইরে থেকে এর কোনো অস্তিত্বই বোঝা যায় না। অবশ্য এটি এখন আর তৃতীয় চক্ষু নয়, এটি পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড (Pineal gland) নামে পরিচিত। বিবর্তনের পথে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের তৃতীয় চক্ষু শেষ পর্যন্ত গ্ল্যাণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে।

রহস্যময় তৃতীয় নেত্রটি কিন্তু মোটেই বড় নয়। মানুষের বেলায় এটির ওজন ০'১—০২ গ্রাম অর্থাৎ বর্তমানের কুমীরের ও বিলুপ্ত দৈত্যাকার প্যানগোলিনস্ (Pangolins)-এর চোখের চেয়েও অনেক ছোটো। নিম্ন ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণীদের এই অঙ্গটির ছাঁদ প্রায় সাধারণ চক্ষুর মতোই।

বাইরের দিকে থাকে স্ফটিক আকারের লেন্স এবং এর মধ্যে ভর্তি থাকে এক ধরনের স্বচ্ছ জেলির মতো পদার্থ যাকে বলে ভিট্রিয়াস (Vitreous) পদার্থ। তা ছাড়া থাকে প্রাথমিক স্তরের রেটিনা, আলোক-গ্রাহী কোষ এবং নালিকা-ঝিল্লীর (Vascular membrane) অবশিষ্ট অংশ। তা ছাড়া চক্ষুর মতো এতে স্নায়ুও আছে।



তৃতীয় চক্ষু

মাত্র একশ বছর আগে যখন তৃতীয় চক্ষু সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবার সময় এলো তখন বিজ্ঞানী মহলে সে কি উত্তেজনা! চোখের ব্যাপার নিয়ে নানা অদ্ভুত অদ্ভুত প্রকল্প, নানা রঙীন ধারণা বিজ্ঞানীরাই করতে লাগলেন। কিন্তু কোনো বিশেষ উত্তেজনায় বেশীদিন তো আগুন পোহানো যায় না। সুতরাং

যখন দেখা গেল যে, প্রত্যেকটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর তৃতীয় চক্ষু আছে, তখন সেই উত্তেজনা প্রশমিত হলো, শুরু হলো গবেষণাধর্মী কাজের। দেখা গেলো ব্যাঙের মাথার করোটির মাঝখানে এই তৃতীয় চক্ষু, টিকটিকির বেলায় এটি রয়েছে ত্বকের আবরণে, এবং গায়ের আঁশের মধ্যে তা ঢাকা। দক্ষিণ আমেরিকার বিখ্যাত এবং বড় আকারের টিকটিকি যাকে বলা হয় ইগুয়ানা (Iguana) তাদের গায়ের আঁশই হলো স্বচ্ছ ; আবার নিউজীল্যাণ্ডের টিকটিকি তাদের বলা হয় টুয়াটারা (Tuatara)। এই তৃতীয় চক্ষুটি একটা স্বচ্ছ পাতলা আবরণীর দ্বারা আচ্ছাদিত। বলতে কি, এ চোখ দিয়ে তারা দেখতেও পায়।

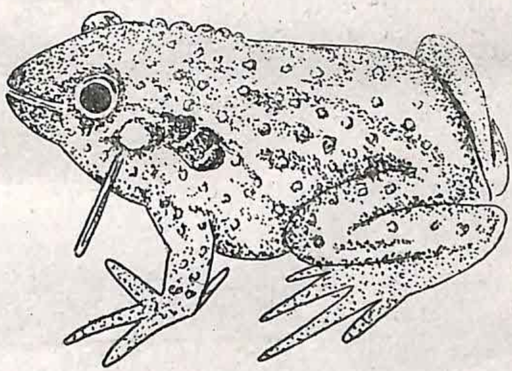
বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লাগলেন এই তৃতীয় চক্ষুর কার্যকারিতার ব্যাপারটি আবিষ্কার করতে। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেল যে, তৃতীয় চক্ষুটি আলোতে সাড়া দেয়, এমনকি রঙের পার্থক্যও ধরে দিতে সক্ষম। ব্যাপারটি মোটেই তুচ্ছ নয়, কেননা অনেক প্রাণী আছে যারা তাদের একজোড়া চোখে রঙের পার্থক্য আলাদা করতে পারে না।

টুয়াটারা হলো এমন এক ধরনের প্রজাতি যাদের জীবন্ত ফসিল বললে অত্যুক্তি হবে না। যখন দৈত্যাকার প্যানগলিনস্ পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াত তখনও ছিলো টুয়াটারা, কিন্তু তাদের ধরন-ধারণ প্রায় অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছে। জীববিজ্ঞানীদের অভিমত হলো যে, অতীত যুগের প্রায় প্রত্যেকটি প্রাণী তাদের তৃতীয় চক্ষু ব্যবহার করতো। আসলে শিকার খোঁজা, বাইরের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হওয়া কিম্বা আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার কাজই ছিলো তৃতীয় চক্ষুর।

অতীতের প্রাণীদের জীবনধর্মের প্রয়োজনেই ছিলো তৃতীয় চক্ষু। কিন্তু রহস্যটা বর্তমানের 'তিন-চোখওয়ালা' প্রাণীদের নিয়ে। দেখা গেছে সরীসৃপরা তৃতীয় চক্ষু দিয়ে দেখতে পায় না, কেননা তাদের গায়ের আঁশের মধ্যে তা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। জীববিজ্ঞানীরা অবশ্য বলেছেন যে, জীবজগতের বিবর্তনের পথে যে-সব অঙ্গ অপ্রয়োজনীয় হয়ে গিয়েছে, তা শেষ পর্যন্ত অবলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু যে-সব প্রাণীর এখনও তৃতীয় চক্ষু আছে, তার কি ধরনের কার্যকারিতা এটাই হলো জীববিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়।

যে-সব প্রাণীদের দেহের রক্ত ঠাণ্ডা তারা এই অঙ্গটিকে থার্মোমিটারের মতো ব্যবহার করে। এ ধরনের প্রাণীরা তাদের দেহের উষ্ণতার মাত্রাকে সুস্থিত কোরে রাখতে পারে না। দিনের তপ্ত-সূর্যের আলো, কিম্বা রাতের হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখে এই অঙ্গের সাহায্যে উষ্ণতার পরিমাপ নিয়ন্ত্রিত কোরে নেয়। কিন্তু দেহটি অত্যধিক মাত্রায় গরম বা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে যখন উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ থাকে না, তখন সর্দি-গর্মি (sun-stroke) কিম্বা ঠাণ্ডায় হিমশীতল হয়ে মারা পড়ে। আসলে তৃতীয় নেত্রটি উষ্ণতা মাপার যন্ত্রবিশেষ এবং সতর্ক-সংকেত।

অবশ্য তৃতীয় চক্ষুটির অন্য কাজটিও উপেক্ষা করার নয়। উভচর প্রাণীদের গায়ের রঙের নিয়ন্ত্রণ করে এই অঙ্গটি। দেখা গেছে অন্ধকার ঘরে কোনো ব্যাঙাচিকে রাখলে তার গায়ের রঙ পাতলা বা হালকা হয়ে যায়। আসলে ব্যাঙাচির দেহে তৃতীয় চক্ষুটি না থাকার ফলে গায়ের রঙ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, তৃতীয় চক্ষু থেকে এক ধরনের হরমোন ক্ষরণ হয়, যাকে বলে মেলাটোনিন (Melatonin)। এই হরমোন গায়ের রঙ হালকা করে দেয়। তবে আলো পড়লে এই হরমোন ক্ষরণ হয় না।



উষ্ণতার নিয়ন্ত্রণ

মাথার ক্র্যানিয়ামের (cranium) মধ্যে লুকানো থাকে এই তৃতীয় চক্ষু। দিন-রাতের পার্থক্য বা পরিবেশ সম্পর্কে খবরা-খবর দেয় এই তৃতীয় চক্ষু। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের গ্রীবাদেশীয় সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু গ্রন্থি (ganglion) থেকে

এসেছে তৃতীয় অক্ষির সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু। এর ফলে তারারন্ধ্রকে (Pupil) বড় কোরে দেয় ওখানকার পেশী। রাতের বেলায় তারারন্ধ্র বড় হয়। দিন-রাতের পার্থক্য নির্দেশ কোরে দেয় পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড। দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোতে থাকলে ইঁদুরের পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড-এর ওজন কমতে থাকে, কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অন্ধকারে থাকলে কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না।

পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড নিয়ে পরীক্ষাগারে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, ব্যাঙাচিদের পরীক্ষা কোরে জানতে পারা গিয়েছে যে উন্নত ধরনের প্রাণীদের এই বিশেষ অঙ্গ থেকে হরমোন ক্ষরণ হয়। এই ধরনের হরমোন ক্ষরণে মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে; তাছাড়া জল-লবণের সমতা রক্ষা, রক্তের উপাদান সংরক্ষণ, খাদ্য পরিপাকের সহায়তা, যৌনক্ষমতা এবং সর্বোপরি আমাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণে এই হরমোন অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ করে। বিশেষ কোরে মানুষের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে এই হরমোন। পরীক্ষা কোরে দেখা গেছে যে, ইঁদুরের এই তৃতীয় চক্ষুটিকে অপসারিত করলে তার দ্রুত বৃদ্ধি হয় এবং তাড়াতাড়ি বাচ্চা প্রসবের ক্ষমতা অর্জন করে। মুরগীর তৃতীয় চক্ষু না থাকলে তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং বেশী ডিম দেয়।

পরবর্তী কালে পরীক্ষা কোরে দেখা গেছে যে পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড রক্তের শর্করার পরিমণাকে পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডের (Pituitary G'and) মাধ্যমে, কিম্বা সরাসরি অগ্ন্যাশয়ের (Pancreas) ওপর প্রভাব বিস্তার কোরে নিয়ন্ত্রণ করে। বেশ কিছু জীববিজ্ঞানীদের অভিমত হলো যে, এই পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড অ্যাড্রিয়েনাল গ্ল্যাণ্ড (Adrenal) এবং থাইরয়িড গ্ল্যাণ্ডকে (Thyroid) নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত করে।

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড বাচ্চা বয়স থেকে প্রায় বার্ধক্যকাল পর্যন্ত সক্রিয় থাকে। তবে বয়স অনুযায়ী তার কার্যকারিতা ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সুতরাং তৃতীয় চক্ষুর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের কোনো ধরনের সন্দেহ থাকা উচিত নয়। অন্তত, বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোরে আমাদের এই কথাটি জানাচ্ছেন।

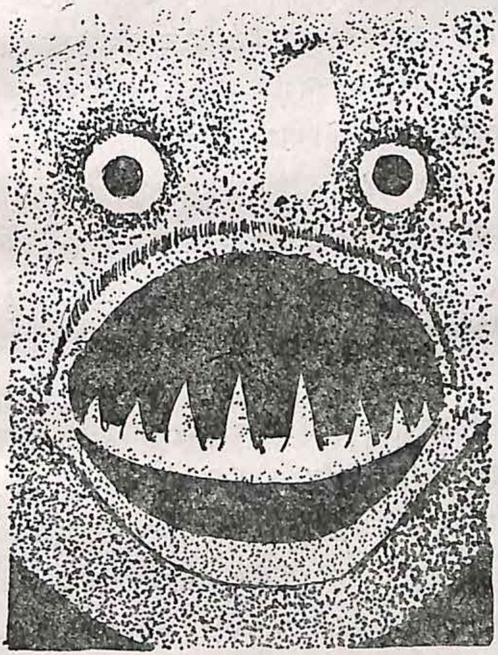
যেদিন থেকে তৃতীয় নেত্রের আবিষ্কার হয়েছে, সেদিন থেকেই সৃষ্টি

হয়েছে বিস্ময়, কল্পনা-জল্পনা, রঙীন ভাবনা। কিন্তু এ কথা ঠিক যে আজ পর্যন্ত তৃতীয় নেত্র সম্পর্কে আমাদের সব কিছু জানা শেষ হয়ে যায় নি। এখনও চলছে নানা ধরনের পরীক্ষা। হয়ত আগামী ভবিষ্যতে তৃতীয় নেত্র সম্পর্কে এমন কিছু আবিস্কৃত হবে যা বিস্ময়েরও বিস্ময়।

আমরা সেদিন কোন্ চোখ দিয়ে সে বিস্ময়-বস্তু দেখবো আজ তা বলতে পারা যাবে না।

মানুষখেকো মাছ

ভ্রমণ সাহিত্যের এক গল্প থেকে দক্ষিণ আমেরিকার এক ধরনের রাক্ষুসে মাছের কথা জানতে পারা যায়। গল্পটি হলো—ঘোড়া চড়ে এক আরোহী



পিরানহার মুখ

এক নদী পার হচ্ছিলেন। এই নদী পার হবার সময় এক ঝাঁক রাক্ষুসে মাছ তাদের মারাত্মকভাবে আক্রমণ করে। কয়েক মিনিট পরে দেখা গেল মাত্র

দুটি কঙ্কাল পড়ে আছে, দেহের আর কোনো অংশ নেই। এ ধরনের আরও অনেক গল্প আছে। হয়ত, এসব গল্পগুলোতে বেশ কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে, কিন্তু এর সবটাই অমূলক এমন ধারণা করা ভুল। কেননা এ ধরনের মাছকে বলে পিরান্‌হা (Piranba)। পিরান্‌হা রাক্ষুসে মাছ, ভয়ঙ্কর এদের জৈবিক ক্ষুধা।

দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা থেকে উত্তর আর্জেন্টিনা পর্যন্ত মিঠে জলে এরা বসবাস করে। অনেক সময় পিরান্‌হা মাছকে বলা হয় ক্যারিব (Caribe)। শব্দটি এসেছে স্পেন ভাষা থেকে, এবং এর অর্থ হলো "বর্বর"। পিরান্‌হা দল বেঁধে শিকার করে। অন্য যেসব মাছ পিরানহার থেকে আকার-আয়তনে ছোটো তাদেরও এরা ধরে-মেরে খায়। কিন্তু অন্য কোনো প্রাণী জলে নামলে এই পিরানহা মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে তাকে আক্রমণ করতে ছুটে যায়। পিরানহা মাছ এত হিংস্র এবং এতই তার জৈবিক ক্ষুধা যে, মাঝে মাঝে নিজেরাই পরস্পরকে আক্রমণ করে, মারে এবং খেয়ে ফেলে।

আঠারো জাতের পিরানহা মাছ দেখা যায়। এদের মধ্যে চার জাতের রাক্ষুসে পিরান্‌হা মানুষ খায়। পিরান্‌হার মাথাটা প্রকাণ্ড, কিন্তু পুরু ছোট্ট দেহ। এরা লম্বায় হয় ২০ সেন্টিমিটার বা ৮ ইঞ্চি। কিন্তু এদের মধ্যে একটি জাত আছে যারা লম্বায় ৬০ সেন্টিমিটার বা ২ ফুট। এদের পূর্ব ব্রাজিলের সানফ্রানসিসকোয় দেখা যায়। পিরান্‌হা মাছেদের মধ্যে এরা ভয়ঙ্কর হিংস্র !

পিরান্‌হা মাছের সব থেকে দেখার মতো জিনিস হলো তাদের বিরাট 'হাঁ'। মুখগহ্বরে ত্রিভুজাকৃতি ধারালো দাঁতগুলো দেখলে গা শিউরে উঠবে। ধারালো দাঁতের তীক্ষ্ণ আগা দিয়ে তারা জীবজন্তুর গায়ের চামড়া ছিঁড়ে দেয়। দাঁতগুলো ক্ষুরের মত ধারালো বলেই তারা খাবলা খাবলা মাংস তুলে নিতে পারে। এদের ওপর পাটি ও নিচের পাটির দাঁত কাঁচির মতো চেপে বসে। তাছাড়া তাদের চোয়ালের মাংস পেশী যেমন সক্রিয়, তেমন জোরালো। তাই পিরানহা সম্পর্কে যেসব গল্পকথা তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দক্ষিণ আমেরিকায় ইঁদুরের মত এক ধরনের প্রাণী আছে যাদের ওজন প্রায় ৫০ কিলো বা ১০০ পাউণ্ড। এই জন্তুদের পুরো

মাংসটা খেয়ে নিয়ে কঙ্কালটা ফেলে দিতে এদের সময় লাগে একঘণ্টার মতো। পিরান্‌হা মাছের পিঠের শিরকে(Ridge) বলে কীল (Keel)। এদের পেটের তলায় আরও একটি কীল আছে। লেজটি সরু হলেও দৃঢ় পেশী আছে। তবে ল্যাজের পাখনা বেশ চওড়া গোছের। এই সব বৈশিষ্ট্যের জন্য পিরান্‌হা জলের মধ্যে প্রচণ্ড গতিতে দৌড় দিতে পারে। বলতে পারা যায়, সাঁতারু হিসাবে পিরান্‌হা মাছের বেশ খ্যাতিও আছে।

পিরান্‌হার রাক্ষুসে স্বভাব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কৌতুহল তো আছেই, জীববিজ্ঞানীরাও এদের সম্পর্কে খুবই আগ্রহী। এ সম্পর্কে, বিশেষ কোরে, দক্ষিণ আমেরিকার নদীতে যাঁরা লম্বা সাঁতার দিয়েছেন তাঁরা বলেছেন, সেই সব নদীতে পিরান্‌হারা থাকলেও তাঁরা কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হন নি। কিন্তু বেশ কিছু ভ্রমণার্থী ব্যক্তিরা বলেছেন, নদীর ধারের গ্রামগুলোতে পিরান্‌হাদের অপকীর্ত্তি তাঁরা চোখে দেখেছেন। গ্রামবাসীদের অনেকের হাতের ও পায়ের আঙ্গুল এই সব পিরান্‌হা মাছেরা কেটে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। শখ করে যাঁরা আকোয়ারিয়ামে পিরান্‌হা মাছ পোষেন তাঁরাও কিন্তু খাবার দেবার সময় নিজেদের আঙ্গুল বাঁচিয়ে কাজ করেন। সুতরাং পিরান্‌হা সম্পর্কে ভীতিটা নিতান্ত অমূলক নয়। পিরান্‌হা মাছেদের কেনো যে এমন রাক্ষুসে স্বভাব তার যথার্থ বিবরণ জীববিজ্ঞানীরা দিতে পারছেন না। যতদূর জানা গেছে, তাতে বলা যায় জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে, বিশেষ কোরে যখন সেখানে বর্ষাকাল তখনই স্ত্রী-পিরান্‌হা ডিম পাড়ে। এই সব ডিমগুলো সামুদ্রিক গাছ-গাছালির ওপর রেখে দেয়। কাজটা অবশ্য স্ত্রী-পিরান্‌হাই কোরে থাকে। বছরের এই সময় পুরুষ পিরান্‌হাগুলো ভয়ানক হয়ে ওঠে। তারা সব সময় ডিমগুলোকে চোখে চোখে রাখে, পাহারও দেয় সর্বক্ষণ। ডিম ফুটে বাচ্চারা যতক্ষণ না স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পুরুষ পিরান্‌হাদের মেজাজ সপ্তমে চড়ে থাকে। কোনো কোনো এলাকায় পিরান্‌হাদের ভয়ঙ্কর আক্রমণ, আবার কোথায়ও বা তাদের শান্তভাব হয়ত উল্লিখিত কারণে হয়ে থাকে। এটা অবশ্য নিতান্ত অনুমানের ব্যাপার। সত্যি সত্যি বাপারটা কি, তা এখনও জানা যায় নি।

চারাসিন্‌স (Characins) বা টেটরাস (Tetras) মাছ পরিবারের অন্তর্গত হলো এই পিরান্‌হা। এদের সব কটা জাত মিঠে জলে থাকে। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার নদ-নদীতে এদের বসবাস। আফ্রিকার 'টাইগার ফিশ' নামে এক ধরণের মাছ আছে তারাও ভয়ঙ্কর হিংস্র, তবে তাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা নেই। এই 'টাইগার ফিশ' লম্বায় ১২০ সেন্টিমিটার বা চার ফুট লম্বা হয়। পিরান্‌হার মতো এদের ক্ষুরধার দাঁত আছে।

সাধারণভাবে আমরা জানি, বাঘ, সিংহ নরখাদক হয়ে ওঠে, কিন্তু নরখাদক মাছ কথাটা অদ্ভুত শোনালেও, সত্যি কথা। যে-কথাটা সত্যি বলে ভাবা যায় না, কিন্তু বাস্তবে তার অস্তিত্ব থাকলেই তা বিস্ময়কর তো বটেই, এমন কি রোমাঞ্চকরও!

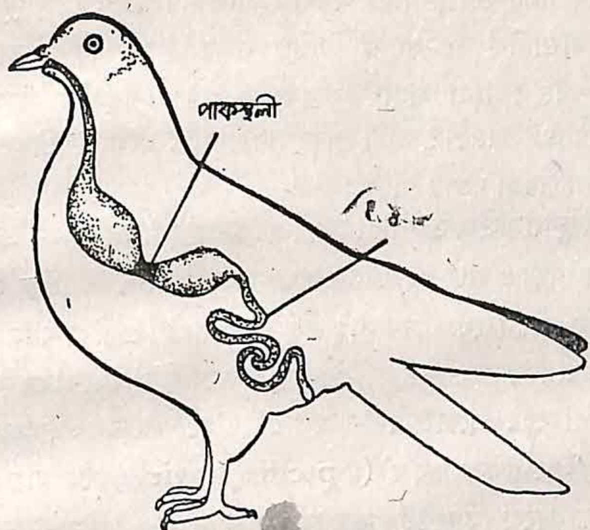
যে সব প্রাণীরা নুড়ি-পাথর খায়

নুড়ি-পাথর যে কোনো মতেই খাদ্য নয়, তা আমরা তো জানি এবং প্রাণীরা তাদের ঘ্রাণশক্তি দিয়ে তা জেনেও নেয়। তবুও দেখা যায় বেশ কিছু প্রাণী স্বেচ্ছায় নুড়ি পাথর খেয়ে ফেলে। কাজটা যে ভুলবশত হয় তা নয়; অন্তত বিজ্ঞানীরা আমাদের বলছেন, কাজটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

দেখা গেছে, যেসব প্রাণীদের দাঁত নেই তারাই দাঁতের কাজ সারবার জন্যে নুড়ি-পাথর খেয়ে নেয়। পাখীর দাঁত নেই, তাই তারা তাদের আহার্য বস্তু গিলে খায়। ঐ সব আহার্য বস্তু পাকস্থলীতে গিয়ে পৌঁছোলে নুড়ি-পাথরের ক্রমাগত ঘস্‌টানিতে খাদ্যবস্তু ভেঙে যায়, গুঁড়িয়ে যায়। তখন খাদ্য পরিপাক হবার যথেষ্ট সুবিধা হয়। অবশ্য পাকস্থলীটি যথেষ্ট পুরু পেশী দিয়ে তৈরী বলেই আহার্য বস্তু নুড়ি-পাথরের ঘর্ষণে অনেকটা পাথরের জাঁতায়-ফেলা শস্যকণাদের মত চূর্ণ হয়ে যায়।

জীববিজ্ঞানীরা তবুও বলছেন, পাখীদের পাকস্থলীতে নুড়ি-পাথরের অস্তিত্বের যথেষ্ট কারণ এতে মেলে না। সত্যিই ব্যাপারটি বেশ ঘোরালো-প্যাঁচালো। পাখীরা কেনো নুড়ি পাথর খায়? ক্ষুধার্ত বলে

তারা যে খায়, তা নয়। তাছাড়া পাকস্থলীর খাদ্য পেষাই করার জন্যেই যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে পাখীরা কি কোরে বোঝে যে, পাথর ঠিক আছে, না ক্ষয়ে গেছে; যদি ক্ষয়ে যায় তাহলে কি কোরে বুঝবে



আবার নতুন করে নুড়ি-পাথর গিলতে হবে? জীববিজ্ঞানীরা বলছেন, এ রহস্যের আবরণ উন্মোচন করা সত্যিই কঠিন।

শুধু যে পাখীরা নুড়ি-পাথর খায় তা নয়। তিমি, সীল, ওয়ালরুস জাতের সামুদ্রিক প্রাণীরাও পাকস্থলীতে নুড়ি-পাথর বোঝাই করে। এসব পাথরের ওজন ৩৫০ থেকে ৫০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়। মাঝে-মধ্যে তারা আবার এই সব নুড়ি-পাথরগুলোকে উগরে দেয়। বিশেষ কোরে ওয়ালরুস, যাদের অনেক সময় বলা হয় পিনিপেডস (Pinnipeds) তারা কিছু সময় ডাঙার ওপর সময় কাটায় বলে সেখানে ঐসব নুড়ি-পাথরের স্তূপ দেখতে পাওয়া যায়। দেখলে মনে হবে তারা যেন সমুদ্র সৈকতে ভূতাত্ত্বিক মিউজিয়াম সৃষ্টি করেছে।

জীববিজ্ঞানীরা তাই সঠিকভাবে বলতে পারছেন না, কেনো এই সব সামুদ্রিক প্রাণীরা তাদের পাকস্থলীতে নুড়ি-পাথর জমা কোরে রাখে। হয়ত পাখিদের মতো পাকস্থলীতে খাদ্য পেষাই করার জন্যই এই সব জিনিষ খায়। বিশেষ কোরে শামুকের মতো শক্ত আবরণ দেওয়া প্রাণীদের আহার্য বস্তু হিসাবে খায় বলেই এই কাজটা করতে হয়। আবার অন্ত্রের মধ্যে যেমন পরাশ্রিতজীবীরা থাকে তাদের পিষে মেরে ফেলবার জন্যেও এই সব নুড়ি-পাথরের প্রয়োজন হয়। কেননা পরাশ্রিত-

জীবীদের মেরে না ফেললে তাদের শরীরের ক্ষত হবার সম্ভাবনা থাকে।

অবশ্য বহুক্ষণ ক্ষুধার্ত থাকলেও প্রাণীদের অনেক সময়ে নুড়ি-পাথর খেতে দেখা যায়। কারণ পাকস্থলীতে কোনো কিছু না থাকলে ঐ অঙ্গটি অনেক সময় গুটিয়ে যায় অথবা এখানকার টিস্যুগুলো কুঁচকে গিয়ে তার স্বাভাবিক কাজকর্মকে বিঘ্নিত ও ব্যাহত করে। তাহলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনো আহার্য বস্তু না পেলে পাকস্থলীর কাজকর্ম বিপর্যস্ত হবে এই কারণেই তারা নুড়ি-পাথর খায়, ফলে পৈষ্টীকতন্ত্রের স্বাভাবিক সক্রিয়তা বজায় থাকে।

বেশ কিছু সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী জন্তু পৈষ্টিকতন্ত্রের স্বাভাবিক সক্রিয়তা বজায় রাখা ছাড়াও অন্য কারণেরও নুড়ি-পাথর খায়। বেশ কিছু জীব-বিজ্ঞানী মনে করেন যে, এসব সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীরা যখন পেট পুরে খায় এবং বিশেষ কোরে চর্বিজাতীয় পদার্থের পরিমাণ বেশী হয় তখন নুড়ি-পাথরের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় তাদের গড় 'আপেক্ষিক গুরুত্ব' (Specific gravity)কমে যায় এবং জলের তলায় সহজে কিছুতেই নেমে যেতে পারে না। কিন্তু ঐ নুড়ি-পাথরের ভার থাকলে জলের তলায় নামতে কোনো কষ্ট পেতে হবে না।

যেসব সামুদ্রিক প্রাণীরা জলের মধ্যে দূর-দূরান্তে পাড়ি দেয় তারা কিন্ত সব সময় পেটের মধ্যে নুড়ি-পাথর বোঝাই কোরে রাখে। এতে তাদের দেহের ওজন বাড়ে এবং সাঁতরে যাবার জন্যে ভারসাম্য বজায় থাকে। অনেক সামুদ্রিক প্রাণীর পেটে নুড়ি-পাথরের ভার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেখা গেছে, কিছু কিছু সীল-এর পাকস্থলীতে ১১ কিলোগ্রামের মত নুড়ি-পাথর আছে।

আসলে যেসব পাখী বা প্রাণীদের দাঁত নেই, তারা চিবিয়ে চিবিয়ে আহার্য বস্তুকে জীর্ণ কোরে ফেলতে পারে না ; কিন্তু প্রকৃতি তো অকৃপণ নন, তাই দাঁতের বদলে এমন সব বিচিত্র উপায় বাতলে দিয়েছেন যাতে সেই সব প্রাণীরা জীবন-ধারণ করতে পারে। অবশ্য জীব-জগতের বিবর্তনের পথে পশু-পক্ষীরা সহজাত প্রবৃত্তির (Instinct) বশে এই সব কাজ কোরে থাকে।

আমরা কেবল আশ্চর্য হয়ে পশু-পক্ষীদের তাজ্জব ব্যাপারগুলো দেখি!

বুদ্ধিমান ডলফিন

ডলফিন হলো ছোটো তিমি, কিন্তু বুদ্ধির দিক থেকে মানুষের পরেই এদের স্থান। এরা সামুদ্রিক প্রাণী, দেখতে মাছের মতো। তবে এরা স্তন্যপায়ী জীব। এরা বাতাস নিয়ে বাঁচে। জীববিজ্ঞানীরা বলছেন ডলফিনের বুদ্ধি কতটা তা সহজে পরিমাপ করা যায় না। কিন্তু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, ডলফিন কায়দা-কৌশল ও চাতুর্য দেখাতে পারে। এদের স্নায়ুতন্ত্র খুবই জটিল ধরনের।

বিভিন্ন ধরনের ডলফিনও আছে। ইউরোপে এদের বলা হয় 'পরপয়িসেস' (Porpoises)। শব্দটি এসেছে ল্যাটিন ভাষা থেকে, এবং এর অর্থ হলো 'হগ-ফিশ' (Hogfish)। জীববিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো যে, 'পরপয়িসেস' নামটি খুবই যুক্তিযুক্ত, কেননা অন্য প্রজাতির মাছের সঙ্গে, (বিশেষ কোরে যারা স্তন্যপায়ী নয়) ডলফিনদের আলাদা করা যায়। তবে 'ডলফিন' ও 'পরপয়িসেস' দুটি নামই চলছে, এবং প্রাণীটিকে বিশেষিত করতে কোনো অসুবিধে হয় না বা হবেও না।

ডলফিনদের মধ্যে 'বট্‌লনোজ'দেরই (bottlenose) আমেরিকার আটলান্টিক সাগর-সৈকতে এবং ভূমধ্যসাগরে দেখতে পাওয়া যায়। এরা হলো মাঝারি-আকৃতির ডলফিন। এরা লম্বায় হয় ৩/৪ মিটার বা ১২ ফুটের মতো। এই ডলফিনের আচরণ বিশিষ্ট ধরনের। এরা জলের স্তম্ভ গড়ে তোলে, নানা ধরনের খেলায় মেতে থাকে। এরা এত বুদ্ধি ধরে যে এদের শেখালে নানা ধরনের কলা-কৌশল দেখাতে পারে, জলের পৃষ্ঠ দেশে লেজে ভর দিয়ে দাঁড়ায়, এমন কি শূন্যে লাফ দিয়ে মাছ ধরে।

এ জাতের ডলফিনরা গান গেয়ে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ রাখে তাদের ধ্বনিবৈচিত্র্যের ভাষা আজও পর্যন্ত জীববিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পারেন নি। এদের স্বরের বৈচিত্র্য সত্যিই বিস্ময়কর। এই সব স্বরের মধ্যে টিক্‌টিক্ শব্দ, হুইসিল-এর তীক্ষ্ণ স্বর, প্যাঁক প্যাঁক ধ্বনি, ভ্যা ভ্যা ডাক ও কিচির-মিচির স্বর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডলফিনরা যে শুধু পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া বা ভাবের আদান-প্রদান করার জন্যে এমন শব্দ করে তা নয়, সমুদ্র পাড়ি দিতেও এই

সব শব্দ করে। বাদুড় যেমন চিঁচিঁ শব্দ কোরে শব্দ-তরঙ্গের প্রতিধ্বনির মাধ্যমে সামনের বস্তুকে চিনে নেয়, ডলফিনরাও তেমনি শব্দ কোরে জলের ভেতর কোথায় কি আছে জেনে নেয়, বুঝে নেয়। সামনে কোথাও কিছু বাধা থাকলে তাকে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে যায়।



শিশু ডলফিনের স্তন্যপান

ডলফিনরা অনায়াসে জলের এক মিটার গভীরে নেমে যেতে পারে যা কৃত্রিম ফুসফুস নিয়েও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ হিসাবে জীববিজ্ঞানীরা বলছেন যে, এদের দেহে মায়োগ্লোবিন (My glodin) বলে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ আছে। তাছাড়া জলের মধ্যে ডুব দেবার আগে এরা পেশীর মধ্যে বাড়তি অক্সিজেন জমা কোরে নেয়। শুধু তাই নয়, জলের গভীরে এদের হৃদ্‌যন্ত্রের সংকোচন হয় অল্প, ফলে অক্সিজেনের পরিমাণ লাগে খুব কম।

এত বড় একটা দেহ নিয়ে ডলফিনরা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সাঁতার দিতে পারে। জীববিজ্ঞানীদের কাছে এটাও বিস্ময়ের ব্যাপার। এদের গতিবেগ হলো ৩০ নট থেকে ৬০ নট পর্যন্ত (এক নট = ১·৫১মাইল)। আসলে ডলফিনদের গা খুবই মসৃণ। এই কারণে সাঁতার দেবাব সময় জলের বাধা (Resistance) পায় কম। এই কারণেই ডলফিনদের চলার সময় ঢেউ হয় না, তাই ঢেউ-এর বাধা অতিক্রম করতেও হয় না। এই সব কারণে অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় ডলফিনরা সাঁতারে পটু।

ডলফিনদের আর একটি অসাধারণ ক্ষমতা আছে। এদের দিক্ নির্ণয় পদ্ধতি বর্তমান কালের নাবিকদেরও হার মানায়। তাছাড়া জল-প্রবাহ, জলের-তাপমাত্রা, গতিবেগ, স্বাদ এবং সূর্য ও নক্ষত্রের অবস্থান থেকে এরা দিক্ নির্ণয় কোরে থাকে। সুতরাং একথা বললে ভুল হবে না যে, মানুষও এই সব গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলি সম্বন্ধে ডলফিন বন্ধুদের কাছে বহুলাংশে ঋণী।

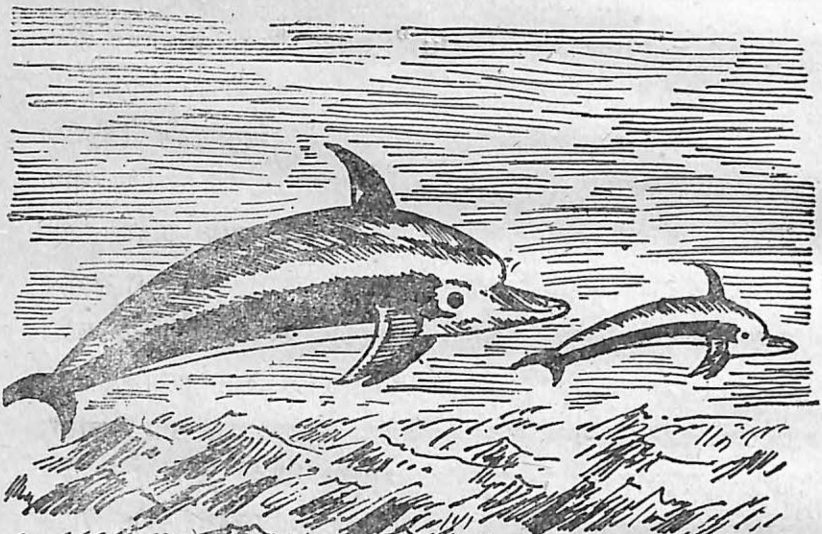
ডলফিনদের কাজে লাগানোর জন্যে আজকের বিজ্ঞানীরা নানা-ভাবে নানা ধরনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। জানা গেছে ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে একটি পোষা ডলফিনের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন ডঃ লিলি। শোনা যায় তিনি নাকি ডলফিনটিকে মানুষের মতো কথা বলাতে শিখিয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে সে তার সহচরীকে বলেছিল—"They deceivedus" অর্থাৎ "এরা আমাদের ঠকিয়েছে"। বলা হয়, ডলফিনটির এই কথা 'টেপরেকর্ড' করা আছে।

কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ডলফিনদের নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল। দুটি ডলফিন পোষা হয়েছিল, একটির নাম ছিল বাজ্‌জ্‌ অপরটির নাম ডেরিস। কি কোরে তারা নিজেরা নিজেদের খাবার ব্যবস্থা করবে সে সম্পর্কে তাদের শিক্ষাও দেওয়া হয়েছিলো। প্রত্যেক ডলফিনের কাছে দুটো লিভার (Levers) থাকতো। তাঁদের শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, বাঁ-লিভারটা টিপলে এক নাগাড়ে আলো আসবে, আর ডান লিভারটা টিপলে আলোর ঝলক পড়বে। প্রত্যেক বারেই তারা ঠিক ঠিক কাজটা করতে পারলে তারা খাবার মাছ পেতো। তারপর কৌশলটাকে কিছুটা পালটে দেওয়া হলো এবং তাতে পদ্ধতিটা একটু জটিলও হলো। ডোরিস তার লিভারটা চাপবার আগে বাজ্‌জকে ছেড়ে দিতে হতো। কেননা ডোরিস আগে লিভারটি টিপলে আহার্য দ্রব্য হিসাবে মাছ পেত না। ব্যাপারটি কিন্তু তারা তাড়াতাড়ি শিখে নিয়েছিলো।

এসবের পর ডোরিস আর বাজ্‌জকে আলাদা করে দেওয়া হলো। তবে তারা পরস্পর ধ্বনি শুনতে পেতো এবং যে আলো ফেলা হতো তা কিন্তু দুজনেই এক সঙ্গে পেতো না। তারপর ডোরিসের ওপর এক নাগাড়ে আলোর সংকেত ফেলা হতো, কিন্তু বাজ্‌জ তা দেখতে পেতো না। ডোরিস কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ধ্বনি-সংকেত

দিতে থাকতো। বাজ্জ তখন বাঁ-লিভারটি চেপে ধরলেই মাছ পেতো। ডোরিসও তখন তার নিজের লিভারটি চেপে ধরলে সেও তার মাছ পেতো। এ ধরণের ৫০টি পরীক্ষার মধ্যে বাজ্জ ও ডোরিস ৪৮টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

ডলফিনদের বুদ্ধির তারিফ না কোরে পারা যায় না। এই কারণেই ডলফিনদের মানুষের কাজে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানোর জন্যে ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লেগেছেন। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের ডুবো জাহাজ খুঁজে বের করতে এবং বন্দরে শত্রুপক্ষের ডুবুরিদের খুঁজ বার করতে ডলফিনদের কি ভাবে কাজে লাগানো যায়, তার জন্যে খুব চেষ্টা চল্‌ছে।



ডলফিনের জলক্রীড়া

এক সময় আজকের এই বুদ্ধিমান ডলফিনরা জল ছেড়ে ডাঙায় বাস করতো। তারপর আবার তারা ডাঙা ছেড়ে জলে চলে যায়। ডলফিনদের জলে ফিরে যাওয়াটা সত্যিই সৌভাগ্যের ঘটনা বলেই মনে করতে হবে। মানুষ যেমন তার বুদ্ধির জোরে ডাঙায় প্রাধান্য বিস্তার করেছে, ডলফিন ও তাদের নিকট স্বজনরা তেমনি মহাসাগরের বুকে বুদ্ধির জোরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত কোরে রেখেছে।

জীবন্ত লণ্ঠন

যেসব প্রাণীরা নিজেদের গা থেকে আলোর ধারা বার করে, তারা বেশীর ভাগ থাকে জলের তলায়। মনে হয় সমুদ্রের গহীন দেশ অন্ধকারে মোড়া থাকে বলেই সামুদ্রিক প্রাণীদের আলো দেবার ক্ষমতা বেশী। এমন কিছু কিছু ছোটো প্রাণী আছে যারা তাদের সমস্ত দেহ দিয়ে আলো জ্বালে যা বড় বড় প্রাণীরা বিশেষ বিশেষ অঙ্গ দিয়ে কোরে থাকে। সমুদ্রের গভীরে এক ধরনের মাছ আছে যাদের বলে "সেফ্যালোপোড়া" (cephalopoda)। এই ক্ষুদ্র চেহারার মাছগুলো আলো দেবার ক্ষমতায় পয়লা নম্বরের অধিকার অর্জন করেছে। আমেরিকার সমুদ্র-সৈকতভূমিতে এক ধরনের মাছ দেখতে পাওয়া যায় যারা লম্বায় ২৫ থেকে ৩৫ সেন্টিমিটারের মতো। এরা গভীর জলের মাছ না হলেও এদের আলো দেবার শক্তি কিন্তু কম নয়।

এ সমস্ত মাছগুলো কিন্তু বোবা নয়। এরা বিশেষ ধরনের স্বর তুলতে পারে। ডিমপাড়ার পর স্ত্রী মাছগুলো পালায়, তবে পুরুষ মাছগুলো ডিমগুলোকে রক্ষা করার জন্যে ভোঁ-ভোঁ আওয়াজ তোলে। এদের গায়ের রং আর আলো-দেওয়ার ধরন খুবই বিচিত্র। মিট্‌মিটে লণ্ঠনের মতো এদের আলো-বিচ্ছুরণের অঙ্গ। দেখতে অনেকটা ছোটো খাটো স্পটলাইটের মতো। এদের আলো বিচ্ছুরণের অঙ্গটি কালো স্বচ্ছ পাতলা আবরণ দিয়ে ঢাকা, কিন্তু ভেতরটা বেশ ঝক্‌ঝকে। এই কারণেই আলোর প্রতিফলন হয় বেশী। জীববিজ্ঞানীদের অভিমত হলো, এরা একমাত্র নারী-পুরুষে মিলিত হবার সময়ই এই আলো ব্যবহার করে থাকে।

খাওয়ার মাছ স্কুয়িডস (Squids) এবং আরও কিছু প্রাণী আছে যাদের আলো-বিচ্ছুরণ অঙ্গটি আলো ফেলার জন্যই ব্যবহৃত হয়। এই অঙ্গটি বেশ বড়ো গোছের এবং দেহের সামনের দিকেই থাকে। কখনও দেখা যায় চোখের ওপরে এই অঙ্গটির অবস্থান। এই আলো ফেলে

তারা সামনের বস্তু ভালোভাবে দেখে নেয়। আবার কিছু কিছু প্রাণী-দের অঙ্গটি এমনভাবে তৈরী হয় যাতে তারা এই আলো নিভিয়ে দিতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে চোখের মতো এক ধরনের অঙ্গ-আবরণী থাকে।

আলো-বিচ্ছুরণী অঙ্গ থেকে কেবল যে এক ধরনের আলো বেরোয় তা নয়; সাদা, নীলচে সবুজ, চুনির মতো লালচে আভা এদের বৈচিত্র্যময় কোরে তুলেছে। মাঝে-মাঝে দেখা যায় এমন কিছু ধরনের প্রাণী আছে যারা তাদের মিট্‌মিটে লণ্ঠন থেকে তিন রকম রঙের আলো ফেলছে। সমুদ্রের অন্ধকার পরিবেশ বৈচিত্র্যময় আলোর প্রলেপে কেমন রহস্যময় হয়ে ওঠে তা একমাত্র ডুবুরিরাই বলতে পারবেন; আমরা ডাঙায় বসে রোমাঞ্চকর পরিবেশের কথা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারি না।

পৃথিবীর প্রায় সব সাগরে 'নকটি লিউক্যা' (Nocti lucae) বলে এক ধরনের প্রাণী আছে। ছোটো ছোটো বলের মত দেখতে; আয়তন বেশী হলে ২মিলিমিটারের বেশী হয় না। বলের যেখানটায় একটু দেবে গেছে সেখানেই আছে এর মুখটি। নকটি লিউক্যার আলো দেবার ক্ষমতা আছে। এরা সাধারণত ক্রান্তীয় এলাকায় থাকে এবং 'ক্রিপটোমোনাড'দের (Cryptomomads) আশ্রয় দেয়। এই ক্রিপটোমোনাডদের দেহে থাকে ক্লোরোফিল। গাছ-গাছালির মতো এরা পরিবেশ থেকে কার্বন-ডাব-অক্সাইড গ্রহণ কোরে শর্করা জাতীয় খাদ্য সংশ্লেষণ করে। কিন্তু এর জন্যে প্রয়োজন হয় আলোক-শক্তির। 'নকটি লিউক্যা'র ছেড়ে-দেওয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং আলো—দুটোই পায় ক্রিপটোমোনাড। ফলে তারা দিন-রাত অহরহ খাদ্য তৈরী করে। তাছাড়া 'নকটি লিউকা'র ছেড়ে-দেওয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং ক্রিপটোমোনাড-এর ছেড়ে দেওয়া অক্সিজেনে পরস্পরে দেওয়া-নেওয়ার কাজটা সেরে দু'জনেই বাঁচে। তাই আলোর ধারা সমুদ্রের অন্ধকার বুককে আলোকিত কোরে তোলে।

জীবন্ত-লণ্ঠন নিয়ে কেবল সামুদ্রিক প্রাণীরা ঘোরাফেরা করে তা নয়, মাটির বুকেও নানা ধরনের কীট-পতঙ্গ এই আলো জ্বালাবার দায়িত্ব নেয়।

জোনাক পোকারা আলো দেয় রাতে। অন্য আলোর মত জোনাক পোকারাও আলো দেয়—তবে এ আলোতে তাপ নেই বললেই চলে। এই আলোর নাম হলো বায়োলুমিনেসেন্স (Bioluminescence) বা বলতে পারা যায় জৈব-উজ্জ্বলতা। জীববিজ্ঞানীরা বলছেন, জোনাক পোকাদের দেহে 'লুসিফেরিণ' (Luciferiu) বলে এক ধরনের পদার্থ থাকার ফলে এই উজ্জ্বলতা আসে। তবে 'লুসিফেরাসে' (Luciferase) বলে আরও একটি পদার্থ আছে যেটি অনুঘটকের কাজ করে। 'লুসিফেরিণ' যখন অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে তখন 'লুসিফেরাসে'র উপস্থিতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। আর এই সময়েই জোনাক পোকারা আলো ছড়িয়ে দেয়।

দিনের বেলায় জোনাক পোকারা ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। রাত হলেই তাদের কাজের শুরু। তবে কি ভাবে এবং কেনো যে তারা আলো দেয় তার সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিতে জীববিজ্ঞানীরা পারছেন না। হয়ত, মিটিমিটি আলো জ্বালিয়ে তারা সাথী খুঁজে বেড়ায়। তা ছাড়া যেসব রাত-জাগা পাখীরা পোকা-মাকড় ধরে খায় তাদের কাছে জোনাক পোকারা হলো সাবধান চিহ্ন। জোনাক পোকারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট ধরেই খায়। তবে স্ত্রী জোনাক পোকারা পুরুষ-জোনাক পোকাদের চেয়ে কিছু বড়। স্ত্রী-জোনাক পোকারা লম্বায় প্রায় তিন সেন্টিমিটারের মত হয়ে থাকে। এই জন্যে স্ত্রী-জোনাক পোকারা একটু বেশী আলোই দিয়ে থাকে।

এ ছাড়া ব্যাঙের ছাতার মত মাশরুমরা (Mushroom) বেশ ভালোই আলো দিয়ে থাকে। ব্রাজিলের ক্রান্তীয় বনাঞ্চলে এদের প্রচুর সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়। রাতের অন্ধকার চিরে এদের আলো পড়লে ব্রাজিলের গ্রামবাসীরা বনের মধ্যে চলতে পারে, পথের নিশানাও পায়। সামুদ্রিক মাছেদের মধ্যে ক্রেফিশ (crayfish) বলে এক ধরনের মাছ আছে তারাও আলোর দীপ্তি দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানী অফিসাররা রাতের কাজকর্ম সারার জন্য ক্রেফিশ ব্যবহার করতেন।

জীবন্ত-লণ্ঠনের কেনো যে এমন ধরন-ধারণ তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা-

বিশ্লেষণ জীববিজ্ঞানীরা দিতে পারছেন না। তবে দেখা যায় এই আলো-বিচ্ছুরণকারী প্রাণীরা অন্ধকার জায়গায় থাকে। স্বভাবতই অন্ধকারের বুক চিরে আলোর ফোয়ারা তারা তুলবেই। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় যে এরা অন্ধকারে সাথী খুঁজে বেড়ায়, নিজেদের বাচ্চাদের কিম্বা স্বজনদের রঙের এবং আকৃতির বৈশিষ্ট্য দেখে চিনে নেয়, অথবা শিকার বস্তুকে আকর্ষণ করে অথবা দেখে নেয়। এ ছাড়া আরও কত কি বৈশিষ্ট্য আছে জীববিজ্ঞানীরা তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না।

জৈব-উজ্জ্বলতার নিশানা পেয়ে বিজ্ঞানীরা আজ উঠে পড়ে লেগেছেন যে, এ ধরনের আলোর ব্যবস্থা কোরে আলোর ঘাটতি মেটানো যায় কিনা। আমরা সেদিন আর এক বিস্ময়ের সম্মুখীন হবো, যেদিন মানুষ কৃত্রিম উপায়ে এই বায়োলুমিনিসেন্স সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

আর সেদিন হবে বিস্ময়ের বিস্ময়!

জলের মাছ জল পান করে না

মাছ জলে থাকে অথচ জল পান করে না, এ কথাটা শুনলে আমরা একটু দিশেহারা হয়ে যাই। অথচ মাছেরা মুখে জল নিয়ে খেলা করে, বিচিত্র ধরনের বুদবুদ তোলে বা সোজা কোথায় ফুট কাটে। যাঁরা বিশেষ কোরে মাছেদের এই খেলা দেখেছেন তাঁরাই বলতে পারবেন মাছেদের মুখে জল নিয়ে ফুট তোলার বহর কেমন। স্বভাবতই মুখে জল নিলে কিছুটা যে পেটের মধ্যে চলে যাবে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু আসল প্রশ্নটা হলো তৃষ্ণার্ত হয়ে মাছ জল পান করে কিনা! জীববিজ্ঞানীরা প্রশ্নটিকে এই ভাবে দেখেছেন বলেই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেবার চেষ্টা করেছেন।

জলের মাছ জলে থাকবে এ কথাটা নিয়ে কারুর কোনো মাথা-ব্যাথা নেই। সেটাই স্বাভাবিক। তবে সব ধরনের মাছ এক জায়গায় থাকে না বা বসবাস করে না, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মাছ তাদের নিজেদের বসবাসের জায়গাটা নির্বাচন কোরে নেয়। কোনো

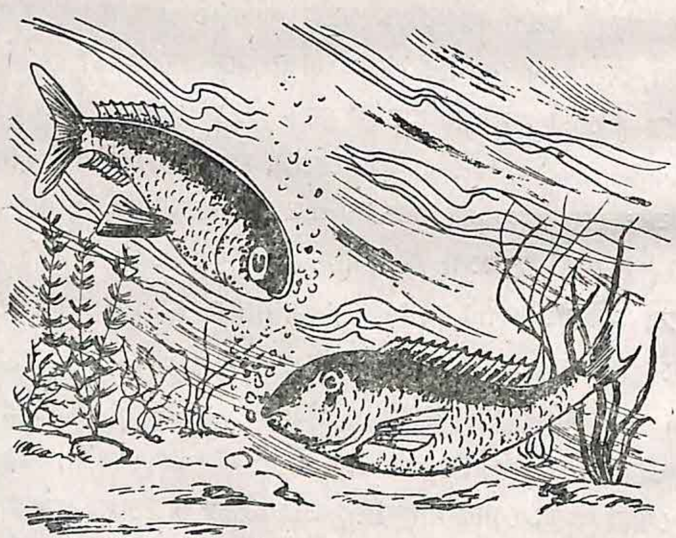
কোনো মাছ থাকে মিঠে জলে, কোনো কোনো মাছ থাকে লোনা জলে। তবে এমন ধরনের কিছু মাছ আছে যারা মিঠে জল থেকে লোনা জলে চলে যায় অর্থাৎ এসব প্রজাতির মাছেরা মিঠে ও লোনা জলে স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করতে পারে। এদিক থেকে 'এল' মাছ হলো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। 'এল' মাছ অর্ধেকটা জীবন কাটায় মিঠে জলে, আর বাকী অর্ধেক জীবনটা কাটায় লোনা জলে। জীব-বিজ্ঞানীরা বলছেন, মাছের দেহ-গঠন পদ্ধতি ও দৈহিক ক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে বলেই তাদের ধরন-ধারণ এত বৈচিত্র্যময়।

মাছের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ, যেমন—মুখগহ্বর, কানকো, ফুলকো প্রভৃতি এবং কোষ, কলা ও অন্যান্য অঙ্গের গঠন প্রণালী এমনই ধরনের যে এই সব অঙ্গের মধ্য দিয়ে সহজেই জল চলাচল করে, এমন কি লবণ ও অন্যান্য পদার্থ যাতে দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্যে যেন সব বিচিত্র ছাঁকনির ব্যবস্থা আছে। মাছের দেহের মধ্যে যে জল-চলাচলের ব্যবস্থা রয়েছে তা ঘটছে অভিস্রবণ ক্রিয়ার ফলে। মিঠে জলের মাছের দেহে রক্ত ও কলা থেকে যে জলীয় তরল পদার্থ ক্ষরণ হয় তাতে থাকে লবণ ও প্রোটিন। এর ফলে মাছের দেহের মধ্যে অভিস্রবণের চাপ মিঠে জলের চাপকে (শূন্য পর্যায়ে থাকে) ছাড়িয়ে যায়। ফলে মিঠে জলের মাছ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাইরের জল দেহের মধ্যে টেনে নেয়। কেননা অভিস্রবণ হলো এমন এক ধরনের প্রক্রিয়া যাতে বেশী পার্শ্বচাপযুক্ত তরল পদার্থের অণুগুলো কম পার্শ্বীয় চাপযুক্ত তরল পদার্থের মধ্যে কোনো অর্ধভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয়। মাছের দেহে এভাবে জল চলাচল না করলে মাছের দেহ জলে ভর্তি হয়ে যাবে, ফুলে ঢোল হয়ে মাছ মারা পড়বে। সুতরাং মিঠে জলের মাছরা এখনও জল পান করে না, করতেও হয় না।

লোনা জলে যেসব মাছ থাকে এবং যাদের হাড়গুলো বেশ মজবুত তাদের ব্যাপারটি অন্য রকমের। এদের বেলায় বাইরের লোনা জল মাছের দেহের তরল পদার্থকে টেনে নেবার চেষ্টা করবেই, ফলে মাছেদের গা যাবে শুকিয়ে। কেননা লোনা জলের মাছেদের দেহের

মধ্যেকার চাপ অল্প। বলতে কি, অভিস্রবণের চাপ এখানেও আছে, তবে মিঠে জলের মাছের বেলায় যা, এখানে তার উল্টোটা হয়। সুতরাং লোনা জলের মাছকে জল পান করতেই হয়, এছাড়া, তাদের বাঁচবার আর অন্য কোনো উপায় নেই।

জীববিজ্ঞানীরা বলছেন যে, সমুদ্রের সব মাছই তৃষ্ণার্ত হয় না। বিশেষ কোরে সার্ক জাতীয় মাছেরা সমুদ্রের লোনা জলে নিজেদের এমনভাবে মানিয়ে নিয়েছে যাতে তৃষ্ণার্ত হতে হয় না। যে কোনো প্রাণী তাদের দেহের মূত্রকে বার কোরে দিয়েই সুস্থতা বজায় রাখে, তা না হলে রক্তের সঙ্গে মূত্র মিশলে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা থাকে, তবে সমুদ্রের এই সব মাছেদের কানকোর এমন এক ধরনের আবরণী আছে যাতে রেচন পদার্থ হিসাবে ঐ মূত্র সহজে বেরিয়ে যেতে পারে না। এই কারণেই তাদের দেহের অভিস্রবণের চাপ সামুদ্রিক অন্যান্য মাছেদের তুলনায় অনেক বেশী। মিঠে জলের মাছেদের মত এদের শারীরিক ক্রিয়া। সুতরাং এ ধরনের লোনা জলের মাছেদের তৃষ্ণার্ত হতে হয় না।



সুতরাং কথাটা আশ্চর্যের মত শোনালেও কথাটা মেনে নিতে হয় যে, জলে থেকেও মাছ জল পান করে না।

মরুভূমির জাহাজ

মোটরগাড়ি ও বিমান আবিষ্কার যতদিন হয় নি ততদিন মরুভূমিতে যানবাহনের প্রধান ও একমাত্র অবলম্বন ছিল উট। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, বর্তমান মরুভূমিতে যানবাহনের জন্যে উটের ব্যবহার নেই। এখনও মরুভূমিতে উট চলে। আর মরু-বালুর বিস্তীর্ণ পথ হেঁটে হেঁটে উট চলতে পারে বলেই উটকে বলা হয় "বালু-সমুদ্রের জাহাজ"।

মরুভূমিতে সহজে ও স্বচ্ছন্দে উট যে চলাফেরা করতে পারে তার একমাত্র কারণ হলো উটের বিশেষ ধরনের দেহগত বৈশিষ্ট্য আছে বলে। উটের অন্যতম দেহগত বৈশিষ্ট্য হলো পিঠের ওপর কুঁজের অস্তিত্ব। এই কুঁজ যখন নিরেট থাকে তখন এটা বেশ শক্ত ও উঁচু হয়ে থাকে। কিন্তু কুঁজ যখন খালি হয়ে যায় তখন কেমন যেন এলিয়ে পড়ে থাকে। অর্থাৎ ঝুলে-পড়া খালি কুঁজটাকে দেখতে লাগে অনেকটা থাকে-থাকে-ভাঁজ-পড়া-পড়া থলথলে মাংসপিণ্ডের মতো। এই কুঁজের মধ্যে কোনো হাড় নেই, এটা মূলত চর্বি ও মাংস পেশী দিয়ে তৈরী।

পিঠের ওপর শক্ত সামর্থ কুঁজ হলো উটের মজুত খাদ্য ভাণ্ডার। মরুভূমিতে লম্বা পথ পাড়ি দেবার আগে উটের মালিকরা তাদের নিজেদের উটগুলোকে ঠেসে খাবার ও জল খাইয়ে দেয়। এ সময় উটগুলো খায়ও বেশী। বেশী খায় বলেই পিঠের ঝুলে পড়া কুঁজটা আস্তে আস্তে মাথা তোলে, তারপর শক্ত হয়ে ফুলে ওঠে। তখন ঐ কুঁজের ওজন দাঁড়ায় ১১০ থেকে ১২০ কেজির মতো। কুঁজের ঐ চর্বিই হলো উটের পাথেয়, অর্থাৎ পথে যদি কোনো আহার না মেলে তাহলে ঐ চর্বি খাদ্যের যোগান দেবে। তাছাড়া উট যে পরিমাণ জল এক সঙ্গে পান কোরে নেয় তাতে তারা স্বচ্ছন্দে বেশ কয়েক দিন পর পর চলতে পারে।

জীববিজ্ঞানীদের কাছে আমরা জানতে পারছি যে, উটের তিনটি পাকস্থলী আছে, প্রথমত, পাকস্থলীতে এরা খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে।

দ্বিতীয়ত, পাকস্থলী থেকে শুধু ক্ষরিত হয় জারক-রস। এই পাচক রসে খাদ্য জীর্ণ হয়ে যায় বলে খাদ্যবস্তুকে পরিপাক করতে কোনো অসুবিধা হয় না। তৃতীয়ত, পাকস্থলীতেই চিবানো ও পাচক-রসে জীর্ণ হয়ে যাওয়া খাদ্যবস্তু পরিপাক হয়। আরও মজার ব্যাপার হলো, প্রথম দুটি পাকস্থলীতে জলের আলাদা আলাদা থলিও আছে। জল খাবার পর জলের থলি যখন বোঝাই হয়ে যায় তখন পেশীর চাপে থলির মুখটা বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং মজুত জলের ভাণ্ডার থাকে প্রথম ও দ্বিতীয় পাকস্থলীতে। যখন জলের প্রয়োজন হয় তখন পেশীর চাপে সেটি আলগা হয়ে যায় এবং থলি থেকে প্রয়োজন মত জল বেরিয়ে আসে। এরপর আবার পেশীর চাপেই থলির মুখ বন্ধ হয়ে যায়।

জীববিজ্ঞানীরা বলছেন যে, বিশেষ কোরে চর্বি ও শর্করা জাতীয় খাদ্য জারিত হয়ে জল ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। কার্বন-ডাই-অক্সাইড দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, পড়ে থাকে জল। বিশেষ কোরে মরুভূমির প্রাণীদের দেহের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যে জল উৎপন্ন হয়, সেই জলও তাদের দেহের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। তা ছাড়া উটের দেহের গঠন প্রণালী এমনই ধরনের যে দিনের বেলায় তাদের, দেহ থেকে বাষ্পীয়ভবন হয় না বললেই চলে। বলতে পারা যায় যে চোরা-কুঠরীর মধ্যে তারা এমনভাবে জল সঞ্চয় কোরে রাখে যাতে সহজে বাষ্পীয়ভবন হয় না।

দেহগঠনের এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী না হলে উট কখনও তপ্ত, রুক্ষ মরুভূমির বুকে বাঁচতে পারত না। শোনা যায় মরুভূমির বুকে তৃষ্ণার্ত মানুষ জল পাবার আশায় মাঝে মাঝে উট মেরে তার সঞ্চিত জল পান করে।

যদি হাল্‌কা বোঝা নিয়ে ধীর পায়ে উট মরুভূমির বুকে চলে তা হলে দশ দিন জল না খেলেও তাদের চলে যায়। কথাটা আশ্চর্যের মতো শোনালোও বাস্তব ঘটনা।

সমুদ্রে যারা ধোপার কাজ করে

প্রাণী-রাজ্যে দেখা যায় এক এক ধরনের প্রাণী অন্য প্রাণীদের দেহের ময়লা ও আবর্জনা পরিষ্কার কোরে দেয়। ইজিপ্টে এক ধরনের পাখী আছে যারা কুমীরের চোয়াল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কোরে দেয় এবং তাদের দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে যেসব জোঁক ঢোকে তাদের খেয়ে ফেলে। এ সময় অবশ্য কুমীরগুলো তাদের বিরাট হাঁ-করা মুখ নিয়ে পরম শান্তি পায়।

জীববিজ্ঞানীরা বলছেন যে, বর্তমানে সমুদ্রগর্ভ দেখা যাচ্ছে বহু প্রজাতির মাছ, চিংড়ী ও কাঁকড়া অপর সামুদ্রিক প্রাণীদের সযত্নে দেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কোরে দেয়। সমুদ্রের তলাকার খবর যতদূর পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যায় ৪০টি প্রজাতির মাছ, ৬টি প্রজাতির চিংড়ী, ১টি প্রজাতির কাঁকড়া ধোপার কাজ করে, অর্থাৎ অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীদের দেহ মেজে-ঘষে পরিষ্কার করে দেয়।

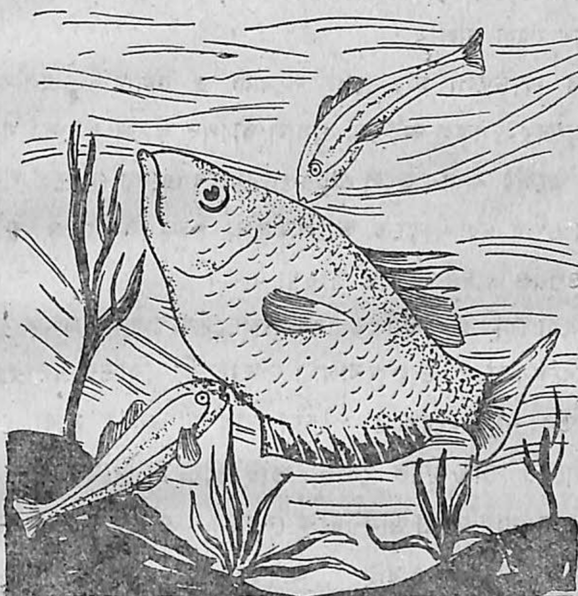
যেসব মাছেরা অপরের দেহ পরিষ্কারের কাজ করে তাদের থুতনিটা একটু উঁচু ধরনের এবং দাঁতগুলো সোন্নার মতো ছুঁচোলো। এ সব মাছের দেহের রঙ বেশ উজ্জ্বল, তা ছাড়া আচরণ পদ্ধতি এমনই ধরনের যে অন্যান্য মাছেরা এদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অবশ্য যেসব প্রাণীদের নিজেদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাতে চায় তারাই চলে আসে এ সব মাছেদের কাছে। এই সব ক্লিনার মাছেদের নির্দিষ্ট একটা জায়গা আছে এবং সেখানেই তাদের মক্কেলরা উপস্থিত হয়। ক্লিনার মাছগুলো যদি কোনো সময় তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পড়তে না পারে তাহলে তাদের মক্কেলরাও আসে না। জীববিজ্ঞানীরা বলছেন যে, ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোরে দেখা গেছে ৬ ঘণ্টার মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায় প্রায় ৩০০ জনের মতো মক্কেলরা এসে জড়ো হয়।

ক্লিনার মাছেদের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য মাছ হলো র‍্যাসে (wrasse), অবশ্য এরা সেনোরিটা (senorita) নামে পরিচিত। এই মাছগুলোর গায়ের রং হলো বাদামী। এরা বিভিন্ন প্রজাতির মাছের হাঁ-করা মুখ থেকে পরাশ্রিতজীব অতি ক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণীদের ঠোক্কোর মেরে মেরে বার কোরে দেয়। তা ছাড়া ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণে কোনো মাছের গা যদি সাদাটে

হয়ে যায় তাদের গা ভালোভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কোরে দিয়ে মাছগুলোকে সুস্থ করে দেয়। এই সেনোরিটা মাছ যখন তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় উপস্থিত হয় তখন ক্লিনার মাছগুলোকে ঘিরে থাকে তাদের মক্কেলরা। ব্যাপারটা কিন্তু দেখার মতো। কেননা সেনোরিটা মাছ যখন কোনো প্রাণীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কোরে দিতে থাকে তখন অন্যান্য মক্কেলরা—যারা নিজেদের গা পরিষ্কার করার জন্যে আসে—অদ্ভুত কায়দায় অপেক্ষা করতে থাকে। ক্লিনার মাছ যাতে ভালোভাবে মুখ ও দেহের অন্যান্য জায়গা পরিষ্কার কোরে দিতে পারে তার জন্যে মেজাজ নিয়ে সেনোরিটার মাছের পরিচর্যা উপভোগ করে। গাল, মুখ, দেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গেলে মাছগুলো ক্লিনার মাছদের কাছে নানা ধরনের অঙ্গভঙ্গী কোরে নিজেদের আনন্দ জানায়। তাছাড়া ক্লিনার মাছেরাও তাদের মক্কেলদের আকর্ষণ করবার জন্য মাঝে-মধ্যে নানা অঙ্গভঙ্গী করে। এ ধরনের অঙ্গভঙ্গী অনেকটা নাচের ছন্দের মতো। ফলে যেসব মাছ নিজেদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাতে চায় তারা অনেক সময় ধাপ্পাবাজদের খপ্পরে পড়ে; কেননা ব্লেন্‌নি (Blenny) নামে এক ধরনের মাছ আছে যারা ক্লিনার মাছেদের মতো নানা রকমের ভঙ্গী দেখিয়ে অন্য প্রাণীদের কাছে টেনে আনে।

বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ী মাছও আছে যারা এই ধরনের ধোপার কাজ করে। কালিফোর্নিয়ায় এ রকম এক ধরনের চিংড়ী দেখতে পাওয়া যায়। এই জাতের চিংড়ীরা দল বেঁধে রাতে সমুদ্রের তলদেশে চলে যায়। এরা অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীদের দেহ থেকে পরাশ্রিতজীবী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীদের দেহ পরিষ্কার কোরে দেয় এবং ক্ষয়ে যাওয়া টিসুগুলো পরিচ্ছন্ন করে। এ ছাড়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এর কাছে এক ধরনের চিংড়ী পাওয়া যায় যাদের বলে পেডারসন (Pederson)। এ ধরনের চিংড়ীগুলো নিঃসঙ্গ জীবন কাটায়, তা ছাড়া এরা এক জায়গায় কুঁড়ের মত বসে থাকতে পছন্দ করে। এদের দেহ বেশ ঝল্‌মলে, গায়ে সাদা সাদা ডোরা কাটা দাগ এবং মাঝে-মধ্যে বেগুনী রঙের গোল গোল দাগও থাকে। মক্কেলরা এদের লম্বা লম্বা শুঁড়ের ঝাপটে আকৃষ্ট হয়। যদি কোনো মাছের দেহ পরিষ্কার করবার প্রয়োজন হয় তাহলে তারা কিছুটা দূরে গিয়ে দেহের যে অংশটা পরিষ্কার কোরে

দেওয়ার দরকার সে দিকটা রেখে অপেক্ষা করতে থাকে। ক্লিনার চিংড়ী মাছটি তখন হামাগুড়ি দিয়ে মাছটার কাছে যায়, তারপর তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কোরে দিতে থাকে। এ ধরনের চিংড়ীদের নির্দিষ্ট জায়গা আছে যেখানে তাদের মক্কেলরা এসে জড়ো হয়।



যে মাছ ধোপার কাজ করে

কেমন কোরে এ ধরনের ক্লিনার প্রাণীদের আবির্ভাব ঘটলো তা জীব-জগতের বিবর্তনের ইতিহাস খুঁজে-পেতে বার করতে হবে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা হলো, এমন সব প্রাণীরা রয়েছে যারা শুধু অপরের অঙ্গ মার্জনা কোরে দিয়েই তৃপ্ত পায় না, নিজেদের দেহের প্রতিরোধ শক্তিও বাড়ায়।

যেসব মাছের মাথার এক দিকে দুটো চোখ

এমন কিছু মজার চ্যাটালো মাছ দেখতে পাওয়া যায় যাদের দুটো চোখ একই দিকে থাকে। অবশ্য চোখ দুটো বাঁ-দিকে থাকবে কি ডান-দিকে থাকবে তা দিয়েই এদের শ্রেণীভাগ করা হয়ে থাকে। এ সব মাছের দেহ-

গঠনে কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না, তাই বেঢপ গোছের এদের দেহাকৃতি। তা ছাড়া যে দিকে তাদের দুটো চোখ সে-দিকের গা বেশ ঝক্‌ঝকে; কিন্তু অপর দিকটা বেশ কালো। যে দিকটা চোখ নেই সে দিকের চ্যাটালো গা এলিয়ে দিয়ে এরা সমুদ্রের তলদেশে শুয়ে থাকে। তা ছাড়া এদের দেহের মধ্যে ফুলকো নেই. কিন্তু সামুদ্রিক প্রাণী হিসাবে এরা স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা চালায়।

এই সব চ্যাটালো মাছগুলো সমোষ্ণ ও ক্রান্তীয় এলাকায় ছড়িয়ে আছে। সমুদ্রের উপকূল অঞ্চলে, প্রবাল দ্বীপের আশে-পাশে, খাড়ির মুখে এবং মিঠে জলের ঝর্ণার জলে প্রচুর পরিমাণে এদের দেখতে পাওয়া যায়। তবে রোদের ওপর এরা থাকতে ভালোবাসে, কিন্তু বালি ও নুড়ি-পাথরের তলদেশের ওপরও এদের দেখতে পাওয়া যায়।

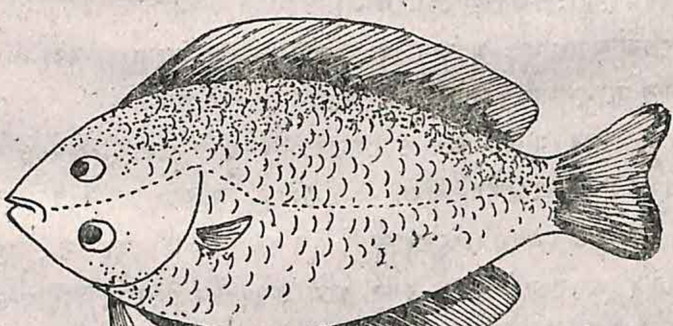
এদের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির ধরন-ধারণ দেখা গেলেও মূলত দুটি পরিবার বা শ্রেণী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতের বিভিন্ন এলাকার উপকূলে ৯৬টি প্রজাতির নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ প্রজাতির মাছের ডান-দিকে চোখ, তাই তারা বাঁ-দিকে শোয়। আবার যাদের বাঁ-দিকে চোখ তারা ডান-দিকে শোয়। এ সব মাছের সংখ্যা প্রচুর এবং মাছগুলি খেতেও সুস্বাদু। এদের মধ্যে একটি প্রজাতি Helibut তিন মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা যায়।

এ ধরনের মাছেরা মাংশাসী। এরা অন্য মাছ, শামুক, নানা ধরনের কীট-পতঙ্গ ধরে-মেরে খায়। তবে ক্ষিধে পেলে এরা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। এই সময় নিজেরা পরস্পরকে আক্রমণ করে এবং একে অপরের মাংশও খায়। মাঝে-মধ্যে আবার ক্ষুধার তাড়নায় ওঁৎ পেতে থাকে অন্য আহার্য বস্তু ধরবার জন্যে। এরা লম্বালম্বি সাঁতার দেয়, তবে জলের তলায় থাকতে ভালোবাসলেও মাঝে মাঝে হালকা মেজাজ নিয়ে জলের ওপর চরে বেড়ায়। স্ত্রী-মাছেরা এক সঙ্গে ৫,০০,০০০ থেকে ১৩,০০,০০০ ডিম পাড়ে। জীববিজ্ঞানীদের অভিমত হলো যে, বিরুদ্ধ পরিবেশে এদের মধ্যে অনেকেই অকালে প্রাণ হারায় বলেই বোধ হয় এক সঙ্গে স্ত্রী-মাছেরা এত সংখ্যায় ডিম পাড়ে।

জীববিজ্ঞানীরা জীবজগতের বিবর্তন লক্ষ্য কোরে অভিমত প্রকাশ

করছেন যে, এই সব মাছেরা এক সময় সমুদ্রের তলায় এক পাশ হয়ে শুয়ে থাকতো। দীর্ঘ দিনের অভ্যাসের ফলে তাদের দুটো চোখই শেষ পর্যন্ত এক ধারে চলে আসে। এর ফলে অবশ্য একটা দিক চোখবিহীন বা অন্ধ হয়ে যায়। তবে মজার ব্যাপার হলো এ সব মাছগুলো যখন বাচ্চা অবস্থায় থাকে তখন তাদের দেহাকৃতি বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণই থাকে। তা ছাড়া বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা চোখ ধীরে ধীরে মাথার ঠিক মধ্যিখানে অন্য চোখের কাছাকাছি সরে সরে আসে। এই পরিবর্তনটা যতটা সহজ বলে মনে হয়, ব্যাপারটি কিন্তু মোটেই সাধারণ ঘটনা বা পরিবর্তন নয়। চোখটি সরে আসার ফলে মাথার হাড়, পেশী ও স্নায়ুর পরিবর্তন ঘটে যায় ; কেননা এক দিকে দুটো চোখ চলে এলে একটি দিক তো অন্ধ। এ সব প্রজাতির রকম-সকম আমাদের চেনা-জানা মাছের মত নয় বলেই এদের বুঝতে আমাদের বেশ কষ্ট হয়।

এ সব চ্যাটালো মাছের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে এরা সুযোগ সুবিধামত গায়ের রং পাল্টায়। পরিবেশের সঙ্গে খাপ-খাইয়ে এরা যে নিজেদের রং পাল্‌টে ফেলতে পারে তা পরীক্ষিত সত্য। জীবজগতে যে



যে মাছের মাথায় একদিকে দুটো চোখ

অভিযোজন চলছে তার একটি আদর্শ নমুনা হলো এ সব প্রজাতির মাছ। এদের অভিযোজন ক্ষমতা দৃঢ় বলেই এরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে চলছে।

এই সব চ্যাটালো এক-দিকে-দু'চোখো মাছের চাষ চলছে অনেক অনেক

দেশে। তবে বৃটেনে এদের গুরুত্ব বেশী। ভারতের বিভিন্ন উপকূলে প্রচুর সংখ্যায় এ সব মাছের অস্তিত্ব থাকলেও আমাদের দেশে এদের নিয়ে কোনো উদ্যোগ-আয়োজন দেখা দেয় নি। তবে ভাবনা-চিন্তা চলছে।

মাছের কথাটা শুনলেই আমাদের রসনা জাগ্রত হয়, এবং কথাটি বেঠিকও নয়। কিন্তু এ ধরনের চ্যাটালো মাছের এক দিকে দুটো চোখ আমাদের চোখে বিস্ময় উৎপাদন করে। আর এটাই হলো রসনার থেকেও বিস্ময়ের স্বাদ।

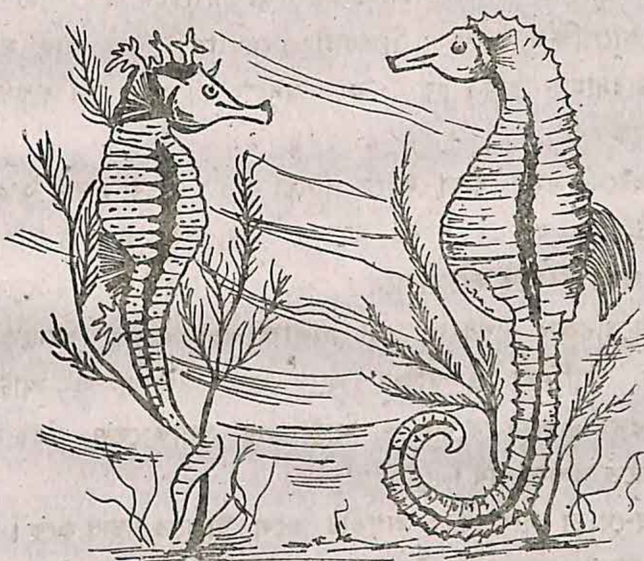
সমুদ্র-ঘোড়ার কথা

প্রাণী জগতের মধ্যে সমুদ্র-ঘোড়া হলো সব থেকে বিস্ময়কর প্রাণী। এদের মাথাটা ঘোড়ার মতো, আর লেজটি বানরের মতো দেখতে। তবে এদের ঘোড়া বলা হলেও এরা মোটেই ঘোড়া নয়, এরা এক রকমের সামুদ্রিক মাছ।

এদের দেহাকৃতি বৈচিত্র্যময়। জীবজগতের বিবর্তনে এরা ঘোড়ার মত মুখ পেয়েছে, লেজ পেয়েছে বানরের মতো। তাছাড়া এরা সোজা হয়ে চলার শক্তি পেয়েছে। ধড়ের ওপর মাথাটি এমন ভাবে রয়েছে যা অনেকটা সমকোণের ছাঁদ ; কিন্তু পেটটা ফোলা। তবে পুরুষ সমুদ্র-ঘোড়ার পেটটাই বড়গোছের ক্যাঙারুর মতো এবং একটি থলিও আছে। এরা ক্ষণে-ক্ষণে গিরগিটির মতো রং পালটায়। গায়ের রংও বৈচিত্র্যময়। গায়ের রং কখনও ব্রোঞ্জের মতো, কখনও খয়েরী, কখনও লালচে, কখনও বা নীল। আসলে এরা পরিবেশের সঙ্গে রং মিলিয়ে আত্মগোপন করে বা আত্মরক্ষা করে। কখনও কখনও দেহ থেকে বিচিত্র ধরনের কাঁটা বের হয় ; ফলে এরা যখন স্থির অবস্থায় থাকে তখন মনে হয় যেন কোনো কাঁটায়-ভরা গাছ দাঁড়িয়ে আছে। আবার এরা যখন গাছপালার সঙ্গে মিলে থাকে তখন এদের বোঝাই মুস্কিল এরা প্রকৃত পক্ষে গাছ কিনা।

এ মাছের দেহে কোনো আঁশ নেই। এদের দেহের হাড়গুলো শক্ত আংটির মতো প্লেটে মোড়া। মাথার আগার দিকটা ক্রমশঃ সরু হয়ে গিয়ে অনেকটা নলের মতো হয়ে গিয়েছে। এই নলের প্রায় ধার ঘেঁসে আছে ছোট্ট একটি মুখ। তবে এদের কোনো দাঁত নেই। সরু নলের দু'পাশে

ছু'টো চোখ, আর চোখের পেছনে আছে হাড় দিয়ে তৈরী কানকো। অন্য মাছেদের কানকো কিন্তু অনেকগুলো হাড় দিয়ে তৈরী। এদের ফুলকোর ছেঁদাগুলো খুবই ছোটো ছোটো, তাছাড়া ফুলকোগুলো গোলাকার এবং কানকোর মধ্যে এদের অবস্থান। এদের দেহে মাংশপেশী খুবই কম। দেহের ওপর হাড়ের প্লেটগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে কাঁটাগুলো। ঘাড়ের কাছে এই কাঁটাগুলোর এমনই ছাঁদ যে, দেখলেই মনে হবে কেশর রয়েছে। আবার কাঁটাগুলো যখন মাথায় থাকে তখন যেন মনে হয় শিং উঠেছে।



সমুদ্র-ঘোড়া

মাথার কাছে দু'পাশে দু'টো পাখনা আছে। এ ছাড়া পিঠের ওপর কাঁটায়-ভরা একটি পাখনা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণ মাছের গায়ে আমরা যেমন শ্রোণী পাখনা, পায়ু পাখনা ও পুচ্ছ পাখনা দেখতে পাই, এদের এসব নেই। পায়ু ছিদ্রের পর থেকেই দেহটি ক্রমশঃ সরু হয়ে গিয়েছে লেজের আকার নিয়ে। কোনো কিছুর ওপর ভর দিয়ে কিম্বা জড়িয়ে ধরে এরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এদের সাঁতার কাঁটার ধরন দেখার মতো। খাড়া হয়ে এদের সাঁতার

কাটতে হয়। দেহে হাড়ের প্লেটগুলো থাকার জন্যে এরা এদের দেহকে স্বচ্ছন্দে বাঁকাতে পারে না বলেই সোজা হয়ে চলতে হয়। পিঠের পাখনার ঝাপটা দিয়ে সাঁতার কেটে চলতে হয় বলে এরা সামনে-পেছনে, ওপর-নিচে বেয়ে বেয়ে যায়। তাছাড়া ঘাড়ের কাছে কেশরের মতো পাতলা বক্ষ-পাখনা ছু'টো সব সময় সঞ্চালিত হয় সাঁতার কাটার গতি নির্ধারণ করার জন্যে। তাছাড়া দেহের মধ্যে যে পট্‌কাটি (Air bladder) আছে তাতে দেহের ভারসাম্য রক্ষিত হয়, এবং খাড়া বা সোজা হয়ে চলতে পারে। তবে কোনো রকমে যদি পট্‌কার মধ্যে থেকে বাতাস বেরিয়ে যায় তাহলে এদের দেহের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) কমে যায়, সঙ্গে সঙ্গে দেহের ভারসাম্যও বিঘ্নিত হয়। ফলে অসহায় ভাবে সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যেতে থাকে।

৫০ ধরনের সমুদ্র-ঘোড়া দেখতে পাওয়া যায়। এরা লম্বায় ২·৫ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার বা ১২ ইঞ্চির মতো। এরা সকলেই প্রায় উষ্ণ মণ্ডলের সমুদ্রের জলে থাকতে ভালোবাসে। এদের মধ্যে ছুটি জাতের সমুদ্র-ঘোড়া থাকে আমেরিকার উপকূলে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে। অনেকেই থাকে ইউরোপে, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল ও আট্‌লান্টিক মহাসাগরে। এছাড়া ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার এলাকাতেও এদের কয়েকটি জাত দেখতে পাওয়া যায়।

সমুদ্র-ঘোড়া সাধারণতঃ অগভীর জলে থাকতে পছন্দ করে। এদের দেখতে পাওয়া যায় সমুদ্রের উপকুলে সামুদ্রিক গাছপালাকে জড়িয়ে থাকতে। সমুদ্র-ঘোড়া মাংশাসী। এরা সামুদ্রিক ছোটো ছোটো মাছ ধরে খায় ও নানা ধরনের ছোটো-খাটো কীট পতঙ্গ এদের আহার্য বস্তু।

যেহেতু পুরুষ সমুদ্র-ঘোড়ার পেটে থলি আছে তাই পেট্‌টা বড়, এবং এই কারণেই তাদের স্ত্রী সমুদ্র-ঘোড়া থেকে সহজেই বেছে নেওয়া যায়। এদের স্ত্রী-পুরুষে অনুরাগ, প্রেমাভিসার বড়ই বৈচিত্র্যময়। প্রথমে পূর্বরাগের পালা। এতে স্ত্রী-পুরুষ মিলে ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মত পরস্পরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে নেচে নেচে জলে আল্‌পনা এঁকে তোলা। মিলনের পালায় স্ত্রী সমুদ্র-ঘোড়া পুরুষের পেটের থলিতে চালান কোরে দিতে থাকে

ডিমগুলো। দেখা গেছে দু'তিন দিনে স্ত্রী সমুদ্র-ঘোড়া ২৫০টি থেকে ৩০০টি ডিম পুরুষের পেটের থলিতে চালান কোরে দেয়। এর পরেই স্ত্রী সমুদ্র-ঘোড়া যেন সমস্ত দায়িত্ব সেরে ফেলে অন্যত্র সরে পড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চাগুলো বড় না হওয়া পর্যন্ত পুরুষরাই এই দায়িত্ব বহন করে। জীবজগতে এ রকম নমুনা সহজে মেলে না বলেই আমরা বিস্মিত হই।

প্রায় ৪৫ দিনের মতো পুরুষগুলো তাদের পেটের থলিতে ডিমগুলো বয়ে বেড়ায়। থলির ভেতরই ডিমগুলো ফুটে বাচ্চা হয়। ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলোর গায়ের রং বেশ ঝক্‌ঝকে ও স্বচ্ছ। লেন্স দিয়ে বাচ্চাগুলোকে দেখলে তাদের হৃদ্‌পিণ্ডের ধুক্‌ধুকুনি পর্যন্ত পরিষ্কার বোঝা যায়। ৪৫ দিনের পর বাচ্চাগুলো থলি থেকে বেরিয়ে যায়। কখনও কখনও দেখা যায় গোল গোল বলের মত তাল পাকিয়ে বাচ্চারা এক সঙ্গে বেড়িয়ে আসে, তারপর খুশীতে ডগ্‌মগ হয়ে যে যেদিকে পারে দৌড় দেয়।

সমুদ্র-ঘোড়াদের সঙ্গে মানুষের পরিচয় বহু দিনের। মদে ভিজিয়ে রাখা সমুদ্র-ঘোড়া অত্যন্ত বিষাক্ত বলেই ধারণা করা হয়। তবে সমুদ্র-ঘোড়ার ভস্ম, মধু ও ভিনিগারের সঙ্গে মিশিয়ে অন্য বিষের প্রতিষেধক ওষুধ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া এক কালে এই পদ্ধতিতে ওষুধ তৈরী করা হতো ; তার ব্যবহার চলতো চর্মরোগে, টাক-পড়াতে ও পাগলা কুকুরে কামড়ালে। সমুদ্র-ঘোড়ার ভস্ম গোলাপের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে ঠাণ্ডা লাগা বা জ্বরের ওষুধ হিসাবেও ব্যবহার করা হতো। চীন দেশের ভেষজ শিল্পে সমুদ্র-ঘোড়ার ব্যবহার আজও চলছে।

সামুদ্রিক মাছ যদি ঘোড়া হয় তাহলে আমাদের কিছুটা বিস্মিত হতে হয়, কিন্তু প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

জীবজন্তুর তাজ্জব হাইড্রলিক যন্ত্র

প্রকৃতি জীবজন্তুদের কতকগুলো যন্ত্র সৃষ্টি কোরে দিয়েছেন যার সাহায্যে তারা বাড়তি কিছু কাজকর্ম করতে পারে। দেহের রক্ত-সঞ্চালনের কাজে কার্ডিও ভাসকুলার সিস্টেম (হৃদপিণ্ড সংক্রান্ত) অপরিহার্য ভূমিকা নেয়

ঠিকই, কিন্তু রক্তচাপের জন্যেই এমন কিছু সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে যা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

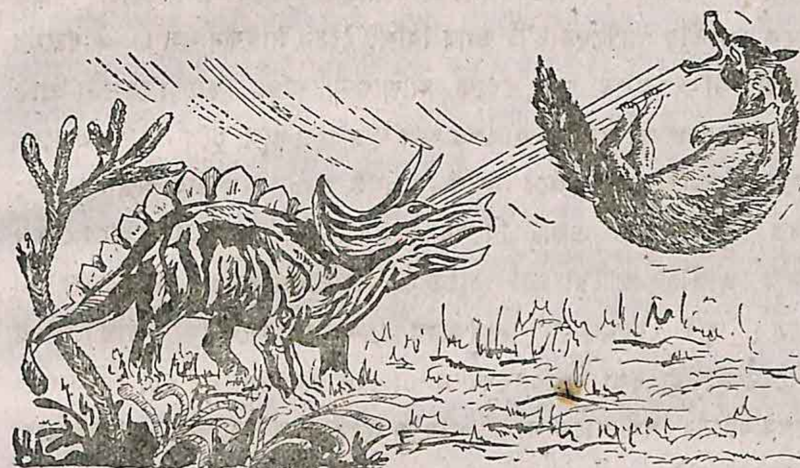
হাইপারটেনশন (Hypertension) বা অত্যধিক রক্তচাপ হলে জীবদেহে নানা সংকট উপস্থিত হয়, রক্ত-সঞ্চালনের কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়, এমনকি রক্ত নালিকাগুলো পর্যন্ত ছিঁড়ে যায়। দেখা গেছে প্রকৃতি এমন সব কৌশল অবলম্বন করেছেন যাতে রক্তচাপ বৃদ্ধি অনেক সময় নানা ধরনের সুবিধা এনে দেয়। মেক্সিকোর মরুভূমিতে এক ধরনের টিকটিকি আছে যাদের শিংওয়ালা ব্যাঙ বলে। এরা এদের দেহে অত্যধিক রক্তচাপ বৃদ্ধির সংকটজনক পরিস্থিতিকে আত্মরক্ষামূলক কাজে লাগায়।

বলতে কি, অত্যধিক মাত্রায় রক্তচাপ সৃষ্টি মোটেই সাধারণ ব্যাপার নয়, এবং ব্যাপারটি খুবই সংকটজনক। রক্তচাপ বাড়তে থাকলে মাথার ঝুঁটি ও অন্যান্য জায়গাগুলো, মেরুদণ্ড ও দেহের অংশগুলো ফুলে সোজা হয়ে ওঠে। ফলে, চোখ-মুখ ও দেহের রং পালটায় এবং জীবজন্তু এমন কি মানুষকেও ভয়ঙ্কর দেখতে হয়। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে সত্যিই ভয়ঙ্কর।

শিং-ওয়ালা ব্যাঙেদের এটাই একমাত্র আত্মরক্ষামূলক উপায় নয়। প্রকৃতি তাদের এক আশ্চর্য ধরনের যান্ত্রিক কলাকৌশলের সুযোগ দিয়ে দিয়েছেন। এই ধরনের টিকটিকিরা যখন কোনো উপকূলে দাঁড়িয়ে থাকে তখন তাদের দেহের একটি বিশেষ পেশী প্রধান একটি রক্তনালীকে এমন ভাবে চাপ দেয় যাতে দেহের রক্ত-চাপ বৃদ্ধি হয় এবং মস্তিষ্কে প্রচণ্ড চাপ পড়ে। এই রক্ত-চাপ এমন হয় যাতে সূক্ষ্ম ঝিল্লী দিয়ে মোড়া রক্ত-নালীটি ফেটে গিয়ে আক্রমণকারী প্রাণীটির মুখে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। আচমকা এই রক্ত পড়তে থাকলে আক্রমণকারী প্রাণী ভয়ে পালিয়ে যায়। এই ধরনের অস্ত্রের গতিসীমা প্রায় ১½ মিটার পর্যন্ত সক্রিয় থাকে।

যে-সব প্রাণীদের এই রকমের অস্ত্র প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকে তারা সাধারণতঃ খোলোস পাল্‌টায়। শিং-ওয়ালা ব্যাঙগুলো বছরে একবার করে খোলোস পরিবর্তন করে। অবশ্য এ ধরনের খোলোস পরিবর্তনের কাজ যে খুব সহজ তা নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশ কষ্টসাধ্য। বিশেষ কোরে যেখানে ঐ বিশেষ ধরনের পেশী থাকে, সেখানে এই কাজটা বেশ শক্ত।

যখন মাথার রক্তবহা নালীতে বেশী চাপ পড়ে তখন দেহের সবগুলো রক্ত-নালীতে চাপ সৃষ্টি হয়, মাথাটা বড় হতে থাকে, এবং পুরানো চামড়াটি ছিঁড়ে



তাজ্জব হাইড্রলিক যন্ত্র

যায়। মাথার চামড়াটা এভাবে ছিঁড়ে গেলে ব্যাঙটি যেন দেহের ঐ অংশটির মেরামতের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।

এরকমের কাজের জন্যে কার্ডিও ভাসকুলার সিস্টেমের ওপর নির্ভর করা উচিত নয় বলেই বোধ হয় প্রকৃতি তা করতে চান নি। কিন্তু এ রকমের পাম্প ও সংযোগকারী ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হবার পর প্রকৃতি যেন হাইড্রলিক্স-এর ওপর গভীর গুরুত্ব দিতে থাকেন। এরকমের কাজটা হলো—কোনো গর্ত কিম্বা কোনো জোড়মুখের জায়গায় তরল পদার্থকে চাপ দিয়ে টিস্যুর কোষকে বাড়িয়ে তোলা যায় এবং এর ফলে টিস্যুতে যান্ত্রিক শক্তি সঞ্চারিত হয়। অবশ্য এটি হলো হাইড্রোস্ট্যাটিক কঙ্কাল গড়ে তোলার প্রাথমিক ভিত।

হাইড্রোস্ট্যাটিক কঙ্কাল প্রাণীদের কাছে বেশ প্রয়োজনীয়। দেহের প্রয়োজনেই এটির উদ্ভব হয়েছিলো, তবে দেহের হাড়গুলো যখন মজবুত হয়ে দেহের স্থায়ী গড়নকে রূপ দেয় তখন তার হাইড্রোস্ট্যাটিক কঙ্কালের অস্তিত্ব থাকে না। তবে জীবজগতের বিবর্তনের সঙ্গে বিভিন্ন প্রাণীদের এই অবস্থা থেকে উদ্ভূত হতে হয়েছে। তাছাড়া মাংশাসী প্রাণীদের তরল কার্যকর বস্তু হলো রক্ত।

হাইড্রো-ডাইনামিক যান্ত্রিক কলা-কৌশল এখনও বিস্ময়কর বিষয় হিসাবেই স্বীকৃত। এ ধরনের সেকেলে যান্ত্রিক কলাকৌশলের মধ্যে আছে শামুক জাতীয় প্রাণীদের হু'টি ভ্যাল্ব বিশিষ্ট রেচন সাইফন নল। এ ধরনের প্রাণীরা আশ-পাশের জল থেকে অক্সিজেন, খাদ্য, ছোটো ছোটো প্রাণী অথবা উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দেহাংশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলো চুষে নিয়ে ভেতরের লুকানো খোলে জমা করে রাখে। সেই জল কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং দূষিত রেচন পদার্থ একটি বিশেষ সাইফন নল দিয়ে বার কোরে দেয়। শামুক জাতীয় প্রাণীরা চায় যাতে এ সব পদার্থ পুনরায় দেহের মধ্যে না আসে; তাই রেচনজাত পদার্থগুলো বেশ দূরে ফেলে দিতে চায়। এই কারণের জন্যেই দেখা যায় সাইফন-নলটা বেশ লম্বা গোছের হয়, যদিও এতে বিশেষ ধরনের পেশী থাকে না। শামুক জাতীয় প্রাণীরা যখন খোলের মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে নেয় তখন গোপন খোলের মধ্যে আর জল যায় না, সাইফন-নলটিও সঙ্কুচিত হয়ে আসে।

এ ধরনের হাইড্রো-ডাইনামিক যান্ত্রিক পদ্ধতির নমুনা মেলে মাকড়শার পায়ে এবং যার ফলে তাদের চলন নিয়ন্ত্রিত হয়। অষ্টপদ বিশিষ্ট এই প্রাণীদের পায়ের অংশগুলি ছ'সাতটি অংশে জোড় লাগা-লাগা। এরা বিশেষ পেশীকে আলগা কোরে পা গুলোকে সঙ্কুচিত করে, আবার পেশীর ওপর দিয়ে পা গুলোকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেয়।

যে-সব প্রাণীরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে মাটিতে গর্ত করে তাদের দেহে এই যান্ত্রিক কৌশলটি অপরিহার্য। ভিজে মাটি ফোঁড়বার সময় কেঁচোরা তাদের দেহের গোলাকার পেশীগুলোকে মাথা থেকে শেষ পর্যন্ত গুটিয়ে নেয়। তখন এদের মাথাটা হয় ফোঁড়ের মতো। অবশ্য মাটি শুকনো হলে তা ভিজিয়ে নরম কোরে নেয়। এরপর এরা বুঝে নেয় মাটির মধ্যে কোথায় ছোটো ছোটো ফাঁক আছে। যদি এ ধরনের কোনো ফাঁক খুঁজে না পায় তাহলে দেহের মধ্যে যে হাইড্রো-ডাইনামিক যান্ত্রিক অঙ্গটি আছে তার সাহায্যে কেঁচোটি গ লার চাপ দিয়ে মাটিতে আঘাত করে। দেহের মধ্যে যদি এই চাপ জলের স্তম্ভের ২ থেকে ১৪ মিলিমিটার হয় তাহলে কেঁচোটি ৮'৫ গ্রাম

বল প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। এর পর অবশ্য চাপ দিয়ে দিয়ে বল প্রয়োগ কোরে গর্তটিকে বড় কোরে তুলবে।

জীববিজ্ঞানীরা বলছেন, সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যে স্টারফিশ জাতীয় মাছেদের দেহে এই হাইড্রলিক যন্ত্রটি যথাযথ ভাবে কাজ করতে সক্ষম। এসব ধরনের মাছেদের বাহুগুলোতে গর্ত-গর্ত থাকে এবং এতে ভর্ত্তি হয় জলীয় তরল জাতীয় পদার্থ। এই সব গর্ত থেকে ছোটো ছোটো শাখা নল বেরিয়ে বাহুর তলায় গিয়ে যুক্ত হয়েছে। মাছগুলো যখন নড়তে-চড়তে চায় তখন ঐ তরল পদার্থ গর্ত থেকে নলে ঢোকে এবং নলগুলোকে ফুলিয়ে তোলে আর মাছগুলো তখন তাদের অভিষ্ট দিকে সাঁতার দিতে থাকে। এখানেও ঐ তরলের চাপ পাখনার কাছে পেশীগুলোকে কখনও সংকুচিত ও প্রসারিত করতে থাকে বলেই মাছের পক্ষে সাঁতার দিয়ে চলাটা স্বচ্ছন্দের হয়।

জীববিজ্ঞানীরা তাই বলছেন, প্রাণীদের হৃদপিণ্ড নিশ্চয়ই দেহের রক্ত সঞ্চালনের কাজ কোরে দেহ-যন্ত্রকে সবল ও বলিষ্ঠ কোরে তোলে, কিন্তু হাইড্রলিক সিস্টেমের মতো যন্ত্রের কার্যকারিতাও আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে। তবে প্রাণীদেহের এই যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয় বলেই আমাদের মাঝে মাঝে অবাক কোরে দেয়।

জীবজন্তুর মানসিক বেদনা

জীবজন্তুর অবসাদ-বেদনা আছে কিনা এ নিয়ে বহুদিন থেকেই জীব-বিজ্ঞানীরা কৌতূহলী। কেননা মানুষ একাই মানসিক বেদনায় কষ্ট পায় না, অন্য প্রাণীদেরও যে এ রকমের যন্ত্রণা আছে তা মানুষই বহুদিন থেকে অভিজ্ঞতার দ্বারা জানতে ও বুঝতে পেরেছে।

কুকুর ছানাকে তার মার কাছ থেকে নিয়ে গেলে, কিম্বা গোরুর সদ্যজাত বাচ্চা চোখের আড়াল হলে মায়েরা কাঁদে, ডাকে। বিশেষ কোরে গৃহপালিত জন্তুদের মানসিক বেদনার পরিচয় অনেকেই দেখেছেন, বুঝেছেন। বিশেষ কোরে কুকুরের মত প্রভুভক্ত জীব প্রাণীজগতে চট কোরে চোখে পড়ে না। তাই বোধ হয় কুকুরের প্রভুভক্তি সম্পর্কে বহু গল্প দেশ বিদেশের নর-নারীর মুখে মুখে প্রচারিত হয় বা হয়ে আসছে। অবশ্য বেঁজী, বাঁদর ইত্যাদি

প্রাণীদের কথাটা একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। তাই দেখা যায় মনিবের অবর্তমানে এ সব প্রাণীদের মানসিক যন্ত্রণা তাদের আচরণে ও বিলাপ ধ্বনিতে প্রকাশ পায়। সুতরাং হতাশা ও ব্যর্থতার বেদনায় জীবজন্তুরা যে কষ্ট পায় তা তর্কাতীত।

জীবজগতের উন্নত প্রাণীদের বিভিন্ন রকমের আচরণে মানসিক বেদনার স্পষ্ট প্রকাশ জানা বা বোঝা গেলেও অনুন্নত বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীদের এ ধরনের বেদনা আছে কিনা তা জানার জন্যে জীববিজ্ঞানীদের অসীম আগ্রহ। যে-প্রজাপতি তার রঙীন ডানাগুলো মেলে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাদের কি কোনো মানসিক কষ্ট আছে? জীববিজ্ঞানীরা বলছেন, জীবজগতের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীদের জীবনে কষ্টের এই লক্ষণ বুঝতে পারা যায়। এদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে গেলে পরীক্ষা কোরে দেখতে হয় দলছাড়া হয়ে একাকী ঘুরে-ফিরে বেড়াবার সময় এরা কেমন ধরনের আচরণ কোরে থাকে।

মানুষের কাছে একাকীত্বের বেদনা অপরিসীম। রবিনশন ক্রুশো, আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক-এর মতো বহু গল্প আছে, যেখানে মানুষের নিঃসঙ্গ জীবনের কথা চিত্রিত করা হয়েছে। জনমানবহীন কোনো নির্জন দ্বীপে কোনো ব্যক্তিকে দীর্ঘ দিন একাকী বসবাস করতে হলে তার যে মানসিক বিকৃতি ঘটে তার বহু বহু নজীর আছে। আসলে মানুষ হলো সামাজিক জীব। তাই একাকীত্বের বেদনা সে সহ্য করতে পারে না।

যে জীবজন্তুরা পালে থাকে, ঝাঁক বেঁধে থাকে, তাঁরা কখনও নিঃসঙ্গতাকে মেনে নিতে পারে না। যুথচারী জীবনযাত্রায় যাদের প্রাণের স্ফুর্তি, সুতরাং তাদের একা রাখলে কষ্ট পায়, শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারায়। উন্নত ধরনের প্রাণীরা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের সামলে নিতে পারে, অর্থাৎ কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা তাদের বেশী। আবার বেশ কিছু জীবজন্তু আছে যারা মানুষের সাহচর্য পেয়ে নিজেদের যুথচারী জীবনের কথাকে ভুলতে পারে। বিশেষ কোরে বানরের মতো জন্তুরা মানুষের সাহচর্য পেয়ে নিজেদের একক জীবনের বেদনাকে ভুলে গিয়ে মানুষের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলে।

কিন্তু অনুন্নত জীবের পক্ষে এ ধরনের জীবনযাত্রা কখনও চলতে পারে না, চলেও না। বনের পাখীকে খাঁচায় পুরে রাখলে কিছু কিছু পাখী বাঁচে না।

বড় ধরনের খাঁচায় যদি এক ঝাঁক পাখী রাখা যায় তাহলে তাদের আনন্দ তো জাগেই, বাঁচেও অনেক দিন।

বেশ কিছু মাছ আছে যারা দল বেঁধে থাকে অর্থাৎ এদের নিজেদের একটা সমাজ আছে, আর সেই সমাজের তারা সামাজিক প্রাণী। দেখা যায়, কোনো হেরিং মাছকে কোনো বড় অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখলে দু'চার দিনের মধ্যেই তারা মনঃকষ্টে মারা পড়ে। এক সময় ভাবা হতো, হয়ত নীল সমুদ্রের আকর্ষণেই এরা একাকী থাকতে পারে না; কিন্তু পরবর্তীকালে নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোরে দেখা গেছে তারা সঙ্গ চায়, একাকীত্বের বেদনা তারা তিলমাত্র সহ্য করতে পারে না।

জীববিজ্ঞানীরা কীট-পতঙ্গের জীবনের ধরন-ধারণ পরীক্ষা কোরে দেখে বলছেন যে, বেশ কিছু কীট-পতঙ্গ যূথচারী। শুঁয়ো পোকারা গাছের গোড়ায় দলা পাকিয়ে পাকিয়ে থাকতে খুব পছন্দ করে। এরা গাছ থেকে গাছে, শাখা থেকে অন্য শাখায় লাইন দিয়ে শুধু ঘুরে বেড়ায় না, দেখে নেয় সকলে আছে কিনা। তাই কোনো দল-ছুট শুঁয়োপোকা বাঁচতে পারে না। প্রথমে এই দল-ছুট শুঁয়াপোকার ক্ষিধে চলে যায় এবং স্বভাবতই তার বিপাক ক্রিয়ার কাজ অত্যন্ত ধীরে ধীরে চলতে থাকে। এই দল-ছুট কোনো শুঁয়োপোকাকে যদি তার সাথীকে দেখানো হয় কিম্বা কাচের আড়াল দিয়ে কৃত্রিমভাবে তৈরী করা শুঁয়োপোকাকে (ডামি) দেখানোও হয়, তাহলে তার মেজাজ আসে এবং দ্রুতগতিতে তার বিপাক ক্রিয়ার কাজ চলতে শুরু করে।

পিঁপড়ে, মৌমাছি প্রভৃতি কীট-পতঙ্গের মধ্যে যূথবদ্ধভাবে জীবনযাত্রার ছবিটি জীববিজ্ঞানীরা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। এরা কখনও কোনো মতে একাকীত্বের বেদনা সহ্য করতে পারে না। একাকী এবং খুব ছোটো দল হয়ে গেলে তারা খাওয়া ছেড়ে দেয়, তারপর মারা যায়। একটা দলে যতগুলো প্রাণী থাকা উচিত তা না থাকলে এদের জীবনে সংকট নেমে আসে। পিঁপড়ে কিম্বা মৌমাছির একটা দলে কমপক্ষে পঁচিশটির মত প্রাণী না থাকলে এদের জীবনযাত্রা বিঘ্নিত ও বিপর্যস্ত হয়।

আমরা আমাদের চারপাশের জীবজন্তু বা কীটপতঙ্গদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে থাকি। কিন্তু তাদেরও যে মানসিক বেদনা আছে, তার খোঁজ রাখি না।

তিমি কখনও মাছ নয়

পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম প্রাণী হলো নীল তিমি। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে যত রকম প্রাণীদের আবির্ভাব ঘটেছে তাদের সঙ্গে এদের তুলনা করা যায় না। এরা লম্বায় হলো ৩০ মিটার বা ১০০ ফুট। আজ থেকে ৭০ মিলিয়ন বছর আগে যে-সব ডাইনোসেরাস বাস করতো তারাও নীল তিমিদের থেকে ছোটো। অবশ্য অন্যান্য অনেক জাতের তিমি আছে যারা লম্বায় খাটো। বেলুগা বা সাদা তিমি লম্বায় হয় ৫·৫ মিটার বা ১৮ ফুট। ডলফিনরা হলো ছোটো তিমি। ডলফিনরা ৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়।



তিমি

তিমি হলো স্তন্যপায়ী প্রাণী তারা কখনও মাছ নয়। মা-তিমি তাই তার বাচ্চাকে স্তন্য পান করায়; মানব শিশুর মতো বাচ্চা তিমি মায়ের বুকের দুধ খেয়ে বড় হয়ে ওঠে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের উষ্ণ রক্ত থাকার দরুণ তারা তাদের দেহের উষ্ণতার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। এই কারণে তিমি, সুমেরু সাগরে ঠাণ্ডা জলেই হোক্ কিম্বা ক্রান্তীয় উষ্ণ সাগরের জলেই হোক্, তার দেহের উষ্ণতাকে ঠিক মাত্রায় রাখতে পারে।

তিমিরা সারাটা জীবন সমুদ্রেই কাটায়। স্রোত-বহা দেহাকৃতির জন্যে তিমি দ্রুত গতিতে সাঁতার দিতে পারে। তাদের চলার সময়ে কোনো ধরনের ঢেউ ওঠে না বলেই তারা কোনো রকমের বাধার সন্মুখীন হয় না, ফলে তাদের গতি কমে না। জোরে জোরে লেজটিকে ওপর-নিচে কোরে নাড়তে নাড়তে তারা সাঁতার দেয়। এদের পেছনে পাখনা থাকে বলেই এরা জলের মধ্যে সোজা হয়ে চলতে পারে। তাছাড়া প্যাডেলের মতো সামনের পাখনাগুলো আছে বলেই তারা পথ ঠিক রেখে সাঁতার দেয়। মনে করা হয়, এক সময় তিমি ডাঙার প্রাণী ছিলো। ধারণা করা হয়, এরা ছিলো জলহস্তী বা গোরু জাতীয় প্রজাতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। জীবজগতের বিবর্তনের পরে এরা আবার সমুদ্রে নেমে আসে, সেই থেকেই এরা সামুদ্রিক প্রাণী হিসাবে পরিচিত। এক সময় সামনের পাখাগুলো ছিলো পা। কিন্তু জলের প্রাণীদের তো আর পায়ের প্রয়োজন হয় না, তাই পা রূপান্তরিত হয়েছে পাখনায়। তাছাড়া ডাঙার প্রাণীর পায়ে যেমন আঙ্গুল থাকে, তেমনি পাঁচটি অস্থি এদের পাখনার মাংশের সঙ্গে আবরণী দিয়ে ঘেরা। তবে তিমির পেছনের পা নেই।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মতো তিমি শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে বাতাস নেয়। অন্যান্য সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মতো জলে-গোলা অক্সিজেন গ্রহণ করে না। এই জন্যে মাঝে-মধ্যে এরা সমুদ্র পৃষ্ঠে উঠে আসে অক্সিজেন নেবার জন্যে। তবে জলে ডুব দেবার সময় তারা শ্বাস আটকে রাখে। স্পার্ম-তিমি জলের তলায় এক ঘণ্টা পর্যন্ত থাকতে পারে। কিন্তু এক জন অভিজ্ঞ ডুবুরী মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে দমবন্ধ কোরে থাকতে পারে।

তবে তিমিকে কখনো জল থেকে ওপরে মাথা তুলতে হয় না। কেননা মাথার ওপর দিকটায় একটা বা দুটো গর্ত আছে যা নাকের গর্তের মতো কাজ করে। তিমি যখন জলে ডুব দেয় তখন পেশীর চাপে নাকের একটি গর্ত বা দু'টো গর্ত বন্ধ হয়ে যায়। এই কারণে নাক দিয়ে জল ঢুকে ফুসফুসে যেতে পারে না। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হলো তিমিরা যখন তলায় খাওয়া-দাওয়া সারে তখন গলা থেকে ফুসফুস পর্যন্ত যে-নালী গিয়েছে তা পেশীর চাপে বন্ধ হয়ে যায়; আর এই কারণেই মুখ দিয়ে জল ঢুকে ফুসফুস পর্যন্ত চলে যেতে পারে না।

তিমিরা জলের অনেক গভীরে নেমে যেতে পারে। নীল তিমি সমেত অন্য কয়েক ধরনের তিমি প্রায় ৯০ মিটার বা ৩০০ ফুট পর্যন্ত নেমে যায়। অবশ্য ভয় পেলে ৩৬০ মিটারেরও বেশী নেমে যেতে পারে। তবে স্পার্ম-তিমিরা ১০০০ মিটার জলের গভীরে নেমে যাবার ক্ষমতা রাখে। অবশ্য এরা জলের তলায় যতটা নামতে পারে আবার তত তাড়াতাড়ি জলের পৃষ্ঠদেশে এসে পৌঁছোতেও পারে।

মাথার কাছ বরাবর যে একটা বা দুটো গর্ত নাসারন্ধ্রের কাজ করে তা কিন্তু ফুসফুসের সঙ্গে সংযুক্ত। নলের মতো এখানে যে-পথ তা থেকে ফেনার মতো পদার্থ বেরোয়। এই ফেনা বাতাস নেবার সময় নাইট্রোজেন শুষে নেয়। এই নাইট্রোজেন শরীরের পক্ষে অবাঞ্ছিত এবং ক্ষতিকর বলেই তিমি যখন জলের পৃষ্ঠদেশের কাছাকাছি আসে তখন এই ফেনা ফুৎকার দিয়ে ছেড়ে দেয়; নাইট্রোজেনও বেরিয়ে যায়। দূর থেকে ফেনাকে দেখতে লাগে অনেকটা স্প্রের মতো। মানুষজন ভাবে জলের বুকে ফোয়ারা উঠ্‌ছে।

সাধারণতঃ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের গায়ে লোম ভর্তি থাকে। এই কারণেই তাদের দেহের উষ্ণতার মাত্রাও ঠিক থাকে। কিন্তু মানুষ আর তিমির দেহে লোম নেই বললেই হয়। তবে তিমির চিবুকের ওপর ও গালের কাছাকাছি দু'চার গাছা করে বেড়াল ও কুকুরের মতো গোঁফ থাকে। তবে গোঁফের লোমগুলো চর্বির আবরণ দেওয়া থাকে বলেই উষ্ণতা সঠিক মাত্রায় থাকে। নীল তিমিদের গোঁফের বহর ৩০ সেন্টিমিটারের মতো পুরু। আবার স্পার্ম তিমিদের গোঁফগুলো এর দু'গুণ পুরু।

তিমিদের চর্বিজাতীয় গোঁফগুলোকে বলে ব্লাবার (Blubber)। এই গোঁফের জন্যে তিমিদের মারা হয়। কেননা এগুলিকে ফুটিয়ে প্রচুর তেল পাওয়া যায়। তিমির তেল নানা ধরনের কাজে ব্যবহার করা হয়; যেমন, সাবান, বাতি, প্রসাধন দ্রব্য ইত্যাদি।

তিমিদের কোনো ঘ্রাণশক্তি নেই। এই কারণেই যে, তিমিরা দেখার বোধের ওপর নির্ভর করে, তাও নয়। কেননা সমুদ্রের গর্ভে দেখার কাজটা মোটেই সহজসাধ্য নয়। তাই জলের মধ্যে কোন্ বস্তু কতটা দূরে আছে তা জেনে নেবার জন্যে যে পদ্ধতিটি বা কলাকৌশল অবলম্বন করে তাকে বলে

'সোনার' (Sonar)। তিমিরা জলের মধ্যে এমন ধরনের শব্দ করে যাতে তা কম্পন-তরঙ্গের মাধ্যমে সামনের বস্তুতে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনির মাধ্যমে ফিরে এলে তিমি সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে বস্তুটি আছে কোথায় এবং কতটা দূরে। বলতে পারা যায় ধ্বনি-তরঙ্গের ছবি সৃষ্টি কোরে তিমি তার চারদিকের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

সাধারণতঃ দু'ধরনের তিমি দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকের আহার্য বস্তু আলাদা আলাদা। প্রথম দলে আছে, স্পার্ম তিমি, মাংশাসী তিমি ইত্যাদি। এরা মাছই খায়। এদের দাঁত আছে বলেই শিকার ধরতে পারে। তাই এদের বলে 'দেঁতো তিমি'। স্পার্ম তিমিদের তলার মাড়িতে ৫০টা দাঁত থাকলেও ওপরের মাড়িতে কোনো দাঁত নেই। তাই এরা বড় বড় ধরনের স্কুয়িড (Squ d) ধরে খেতে পারে।

দ্বিতীয় ধরনের তিমিদের বলে 'হোয়েল বোন তিমি' (Whale bone whale) এরা সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণী ধরে খায়, তাছাড়া সমুদ্রের তলদেশে যে উদ্ভিদ জন্মায় তাও খায়। এ ধরনের তিমিদের কোনো দাঁত নেই।

তিমিরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী। বিভিন্ন ধরনের শব্দ কোরে তারা পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। কখনও ঘোঁৎ ঘোঁৎ, কখনও গোঁ গোঁ, কখনও টিক্‌টিক্, কখনও চিঁচিঁ ও কখনও সঙ্গীতের স্বর তোলে। বিজ্ঞানীরা তিমিদের ভাষা বোঝবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। প্রায় হাজারখানেকের ওপর স্বর আজ পর্যন্ত আলাদা করা হয়েছে। কুঁজ পিঠওয়ালা তিমিরা সব থেকে বাচাল। এরা যে গান গায় তা সম্প্রতি ধরে রাখা হয়েছে। এই ধরনের ধ্বনি-সংকেতের সাহায্যেই তিমিরা জোট বাঁধে।

উড়ুক্কু প্রাণী

ধূসর রং-এর কাঠবেড়ালীরা এক গাছের মাথা থেকে যখন অন্য গাছের মাথায় লাফ দেয় তখন দুটো গাছের মধ্যে দূরত্ব কোনো অংশেই কম নয়। দেখা গেছে এই দূরত্বটা ৪ মিটার বা ১২ ফুটের মতো হয়। পা দু'টোকে

ছড়িয়ে দিয়ে লেজটিকে দুলিয়ে এরা স্বচ্ছন্দে এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে চলে।

মনের পটে কাঠবেড়ালীর লাফ-দেওয়াটিকে যদি রেখা-চিত্র টেনে ফুটিয়ে তোলা যায় তাহলে দেখা যাবে যে তাদের প্রায় প্যারাশুটের মতো দেখতে।



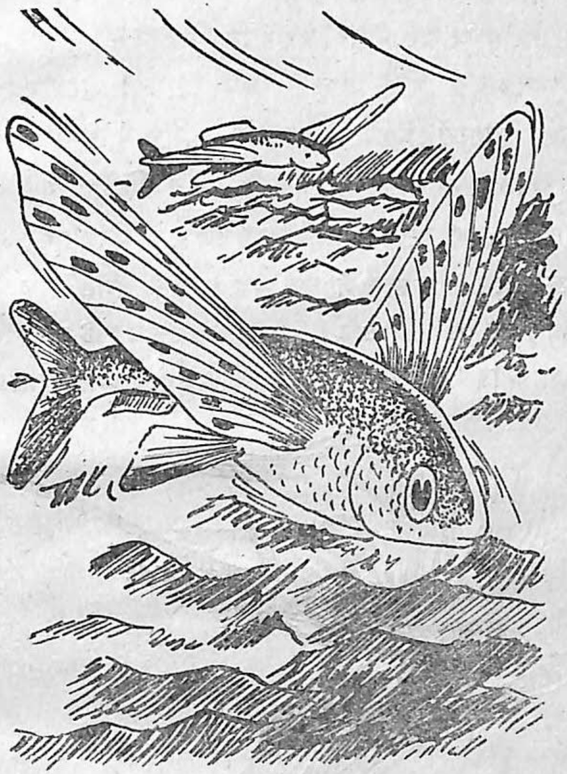
উড়ন্ত কাঠবেড়ালী

তখন আর তাদের লাফ মারতে দেখা যাবে না, মনে হবে উড়ে চলেছে। ধূসর রং-এর কাঠবেড়ালীদের এক জাতি আছে, যাদের সত্যই এই ধরনের প্যারাশুটের ব্যবহার আছে। এই জন্যে তাদের বলে উড়ন্ত কাঠবেড়ালী।

বহু ধরনের প্রাণী আছে যাদের দেহের সঙ্গে এই রকমের প্যারাশুট তৈরী হয়ে আছে। এরা হলো উড়ন্ত ব্যাঙ, উড়ন্ত-টিকটিকি-গিরগিটি এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উড়ন্ত সাপ। তাছাড়া ক্রান্তীয় সমুদ্র অঞ্চলে উড়ন্ত মাছও দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া আছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় লেমুর, যাদের উড়ন্ত লেমুরও বলা হয়ে থাকে।

প্রকৃত পক্ষে এসব প্রাণীরা উড়ে উড়ে চলে না। তাদের চলনটা অনেকটা স্রোতের মতো মন্থর গতিতে যাওয়া। মানুষ নিজে যত দিন না উড়ে যেতে পেরেছে তত দিন পর্যন্ত মানুষ এদের উড়ন্ত প্রাণী হিসাবে মেনে নিয়েছে। আর সেই থেকে তাদের উড়ুক্কু স্বভাবের প্রাণী বলেই মেনে নেওয়া হয়েছে। আজকাল অবশ্য শক্তিচালিত উড়ন্তযানে চলা, আর বাতাস কাটিয়ে ওড়ার মধ্যে আমরা পার্থক্য কোরে থাকি। পাখী, বাদুড় ও নানা ধরনের পতঙ্গ তাদের ডানার সাহায্যে বাতাস কাটিয়ে ওড়ে। তাদের ডানাগুলো মাংশ-পেশীর দ্বারা শক্তিসম্পন্ন। দক্ষিণ-আমেরিকায় এমন কিছু উড়ুক্কু মাছ আছে

যারা সত্যি সত্যি উড়তে পারে। এসব মাছেরা তাদের বুকের পাখনার সাহায্যে জলের ওপর লাফিয়ে ওঠে এবং প্রায় ৫ মিটার বা ১৫ ফুট পর্যন্ত বাতাসে উড়তে পারে। এসব মাছগুলো ২৫ সেন্টিমিটার বা ১০ ইঞ্চির মত লম্বা হয়।



উড়ুক্কু মাছ

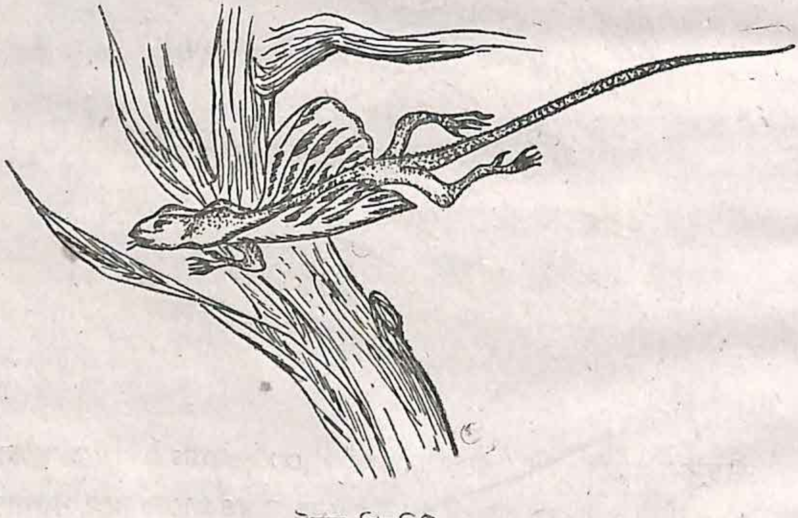
উড়ুক্কু কাঠবেড়ালী ওপোস্সামস (opossums), স্কেলিটেলস, (scalytails) প্রাণীদের আচরণ একই ধরনের, যদিও তাদের সঙ্গে পরস্পরের কোনো জ্ঞাতিত্ব সম্পর্ক নেই। উড়ুক্কু কাঠবেড়ালী এবং স্কেলিটেলসদের সঙ্গে গেছো কাঠবিড়ালীদের জ্ঞাতিত্ব সম্পর্ক।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উড়ুক্কু লেমুর সঠিক অর্থে লেমুর নয়। এই সব উড়ুক্কু লেমুর লম্বা গাছের মাথা থেকে যখন লাফ মারে তখন এদের দেখতে

লাগে চতুষ্কোণ বিশিষ্ট ঘুড়ির মতো। অবশ্য এরা যদি কোনো সময়ে মাটিতে পড়ে, তবে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আবার গাছেও উঠে পড়ে।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই সব উড়ুক্কু প্রাণীরা রাতের বেলায় কাজকর্ম কোরে থাকে। সন্ধ্যার পর থেকেই খাদ্যের অন্বেষণে ঘোরাঘুরি করে। জীববিজ্ঞানীরা বলছেন যে, যেহেতু এরা নিশাচর প্রাণী সেই কারণে এদের সম্পর্কে পুরো তথ্য আজও সংগৃহীত হয় নি।

উড়ুক্কু মাছেদের দুটো জাত। এক জাতের মাছেদের দুটো কোরো পাখনা, অন্য জাতের মাছেদের চারটে কোরে পাখনা। প্রথম জাতের মাছেদের বুকের পাখনা বেশ লম্বা ধরনের; কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের মাছেদের পেছনের পাখনা বেশ বড়ো। যদিও দু'জাতের মাছেরাই একই কায়দায় চলে। শত্রু তেড়ে এলে দ্রুত সাঁতার দেয়, তারপর লেজটাকে জলে কিছুটা ডুবিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপরে ওঠে। লেজের জোর ঝাপট যখন জোরালো হয় তখন তারা পাখনার সাহায্যে বাতাস কাটিয়ে ওপরে চলতে পারে।



উড়ুক্কু গিরগিটি

প্রথমে ঝাপ্টা মেরে এসব মাছেরা ঘণ্টায় ৬৫ কিলোমিটার বা ৪০ মাইল গতি পায়, তবে অল্প ক্ষণের মধ্যে তা নেমে যায় ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার। একবার ঝাপ্টা দিয়ে এরা বাতাস কাটিয়ে ১৪০ মিটার বা ৪৫০ ফুট চলে

যেতে পারে। তবে তাতে সময় লাগে ১০ সেকেণ্ডের মতো। দেখা গেছে, পর পর ১৭টা ঝাপটে এরা প্রায় ৩০০ মিটার কিম্বা ১,০০০ ফুট পথ বাতাস কাটিয়ে যেতে পারে।

উড়ুক্কু টিক্‌টিকি কিম্বা উড়ুক্কু ব্যাঙের গতি উড়ুক্কু মাছেদের তুলনায় নিতান্তই কম। তবে এসব প্রাণীরা যখন ওড়ে তখন তাদের দেখতে হয় মনোরম। ১৩টি প্রজাপতির টিকৃটিকিদের গায়ের রং-এর বাহার বৈচিত্র্যময়। কারুর গায়ে কমলা রং-এর ছোপ, আবার কারুর গায়ে কালো ছোপ। এরা যখন এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফ মারে তখন মনে হয় যেন রঙীন প্রজাপতিরা উড়ে বেড়াচ্ছে।

উড়ুক্কু ব্যাঙেদের চারটে পা। এরা গাছের তলায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ১২ থেকে ১৫ মিটার বা ৪০ থেকে ৫০ ফুট লাফ মেরে বাতাস কাটিয়ে যেতে পারে। এরা পা ছাড়িয়ে এমন বাতাস কাটায় যা কিন্তু দেখার মতো।

এশিয়া মহাদেশে উড়ুক্কু সাপও আছে। এরা এক গাছের ডাল থেকে অন্য গাছের ডালে লাফ মেরে বাতাস কাটিয়ে পৌঁছোয়। এ সময় তারা পাঁজরের হাড়গুলোকে এমন ভাবে বাড়িয়ে তোলে যাতে এদের দেহকে দেখতে লাগে চ্যাপ্টা ধরনের।

উড়ন্ত প্রাণী উড়ুক্কু, এতে কারুর বিস্ময়বোধ হয় না; কিন্তু যাদের ওড়ার কথা নয়, তারা উড়লে বিস্ময়বোধ সৃষ্টি হবেই। তবে প্রকৃতির জগতে কত যে বিস্ময়ের কাণ্ডকারখানা চলছে তার সবটুকু খবর আজও আমরা পাই নি। যেটুকু জানা গিয়েছে তাতেই বিস্ময়ের অন্ত নেই।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রা

রামায়ণে আছে যে, রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণ ছ'মাস জেগে থাকতো আর ছ'মাস ঘুমোতো। ঘুমোতে যাবার আগে আর ঘুম ভাঙার পরে কুম্ভকর্ণকে যে খাদ্য যোগান দিতে হতো তাতে আমরা বিস্মিত ও হতবাক হয়ে যাই। সে যাই হোক, ঘুমের সময়ে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙানো ছিলো দুঃসাধ্য; তাছাড়া কাঁচা ঘুমে কুম্ভকর্ণের শক্তি কমে যাবে এটাই ছিলো বিধি-ব্যবস্থা।

রামের আক্রমণকে প্রতিহত করতে গিয়ে অনেক কষ্টে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙতে হয়েছিলো, আর তার পরিণতি ঘটেছিলো কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে।

দীর্ঘদিন ধরে ঘুমোবার রীতি জীবজগতেও দেখা যায়। তবে এখানে পরিবেশের পরিবর্তনই হলো মূল কারণ। দেখা গেছে, পৃথিবীর কোনো অঞ্চলে যখন প্রচণ্ড শীত পড়ে তখন এই ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পেরে বহু প্রাণী মারা পড়ে। অনেক সময় ঠাণ্ডা লেগে সেখানকার প্রাণীরা বিপর্যস্ত হয়, কিম্বা কোনমতে খাদ্য সংগ্রহ করতেও পারে না। এই কারণে শীতের দেশের প্রাণীরা উষ্ণ অঞ্চলের দিকে পাড়ি দেয়। তাই দেখা যায়, পাখীরা দীর্ঘ পথ অতিক্রম কোরে গরম এলাকায় চলে আসে। পাখীরা উড়তে পারে বলেই তাদের পক্ষে এ কাজটা খুবই সহজ। কিন্তু যে-সব প্রাণীরা তা পারে না, তারা সারা শীতকালটা ধরে ঘুমোয়, আর গরম এলেই দীর্ঘ এক-টানা ঘুম থেকে জেগে ওঠে। একেই বলা হয় শীত-ঘুম। ইংরাজীতে বলে 'হাইবারনেশন'। মূল শব্দটি হলো 'হাইবারনেয়ার' (Hibernare)—তার থেকেই হয়েছে 'হাইবারনেশন'। এর আক্ষরিক অর্থ হলো, সুপ্ত অবস্থায় শীত যাপন করা।

শীত শুরু হবার আগেই প্রাণীরা শীত-ঘুমের জন্যে প্রস্তুত হয়। এই সময় তারা দেহের ওজন বাড়ায়। বিশেষ কোরে প্রাণীরা দেহে চর্বির মজুত ভাণ্ডার এবং যকৃতে ও পেশীতে গ্লাইকোজেন সঞ্চয় কোরে রাখে। জেপাস (Zapus) নামে এক ধরনের ইঁদুর শীত-ঘুমে যাবার আগে প্রতিদিন ২ গ্রাম কোরে চর্বি সঞ্চয় করে। তবে এ কথা ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন যে প্রাণীরা কি ভাবে এবং কেমন কোরে বুঝতে পারে যে 'শীত-ঘুম' আসছে। শীত আসার আগের পরিবেশের উষ্ণতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এটা নিশ্চয়ই একটা সংকেত। তাছাড়া শীত আসার সঙ্গে সঙ্গেই দিনের থেকে রাতের সময়-সীমা বেড়ে যায়। প্রত্যক্ষ অনুভব দ্বারা এ সম্পর্কে জ্ঞান না হলেও এর একটা পরোক্ষ প্রভাব পড়ে। তাছাড়া শীত আসার সঙ্গে সঙ্গেই আহার্য বস্তু পাওয়া বেশ দুরূহ হয়ে ওঠে। সুতরাং এটিও একটি সংকেত।

শীত-ঘুমের সময় সঞ্চিত চর্বি থেকে তারা তাদের বিপাক-ক্রিয়ার কাজ চালায়। তবে এই মজুত ভাণ্ডার থেকে খরচ হয় অল্প পরিমাণে। কেননা

প্রাণীরা এ সময় ঘুমোয়, চলা-ফেরা করতে হয় না এবং খাদ্যের অন্বেষণে দৌড়-ঝাঁপ করতে হয় না বলেই কম পরিমাণ শক্তি ব্যয় হয়।

যেসব প্রাণীদের গায়ের রক্ত উষ্ণ তাদের দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এই সময় এদের দেহের উষ্ণতা কমতে থাকে। ধারণা করা হয় যে, রক্তস্রোতে যে-হরমোন প্রবাহিত হয়, সেই হরমোনই দেহের উষ্ণতা নামিয়ে আনতে নিয়ন্ত্রকের কাজ করে। এই হরমোনটি হলো 'সংবাদবহনকারী', এবং এর প্রভাবেই উষ্ণ রক্তের প্রাণীরা তাদের দেহের উষ্ণতাকে শীত-ঘুমের উপযোগী কোরে তোলে। শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে এই'নিয়ন্ত্রক হরমোন' প্রচুর পরিমাণে ক্ষরণ হতে থাকে। পরীক্ষা কোরে দেখা গেছে যে, অল্প পরিমাণে ঠাণ্ডা পড়লে এ-সব প্রাণীরা শীত-ঘুমের তাড়নায় তড়িত হয় না। সুতরাং যতক্ষণ না পর্যন্ত এক-টানা শীতের কামড় আসে ততক্ষণ পর্যন্ত এদের দেহের নিয়ন্ত্রক যন্ত্রটি (অর্থাৎ ঐ হরমোন) অকেজো অবস্থায় থাকে ; কিন্তু শীত পড়লেই বিকল্প ব্যবস্থা। এই সময় দেহের ক্রিয়াও মন্থর হয়ে পড়ে। জীববিজ্ঞানীরা বলছেন স্বাভাবিক অবস্থার ১০০ ভাগের ১ ভাগ ক্রিয়া-লক্ষণ দেখা দেয়।

যে-সব প্রাণীদের গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা তাদের কিন্তু দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করতে হয় না। এদের দেহের উষ্ণতা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিকের উষ্ণতার তারতম্যের ওপর। সুতরাং-উষ্ণ-রক্তের প্রাণীরা যেমন দেহের উষ্ণতা কমাতে বাধ্য হয়, ঠাণ্ডা-রক্তের প্রাণীদের তা করতে হয় না।

শীত-ঘুমের সময় প্রাণীদের শরীরবৃত্তীয় যে পরিবর্তনগুলি ঘটে তা বিস্ময়-কর। কয়েকটি প্রাণীদের দেহের উষ্ণতা ও বিপাক-ক্রিয়ার নজীর বিজ্ঞানীদের কাছে পাওয়া গেছে।

স্বাভাবিক অবস্থায়	শীতঘুমের সময়
১। হ্যামস্টার (Hamstar)। দেহের উষ্ণতা : ৩৫° সেন্টিগ্রেড ; মিনিটে হৃদস্পন্দনের হার : ২০০-৪০০ বার।	১। হ্যামস্টার। দেহের উষ্ণতা : ৬° সেন্টিগ্রেড। মিনিটে হৃদস্পন্দনের হার : ৪-১২ বার।
২। বাদমী রং-এর বাদুড় (Brown Bat)। দেহের উষ্ণতা : ৪০° সেন্টিগ্রেড। মিনিটে হৃদস্পন্দনের হার : ৪০০-৭০০ বার।	২। বাদামী রং-এর বাদুড়। দেহের উষ্ণতা : ২° সেন্টিগ্রেড। মিনিটে হৃদস্পন্দনের হার : ৭-১০ বার।
৩। মেঠো কাঠবেড়ালী। দেহের উষ্ণতা : ৩৯° সেন্টিগ্রেড। মিনিটে হৃদস্পন্দনের হার : ২০০-৪০০ বার।	৩। মেঠো কাঠবেড়ালী। দেহের উষ্ণতা : ৪° সেন্টিগ্রেড। মিনিটে হৃদস্পন্দনের হার : ২-১০ বার।
৪। উডচাক (Woodchuck)- ইঁদুর জাতীয়। দেহের উষ্ণতা : ৩৯° সেন্টিগ্রেড। মিনিটে হৃদস্পন্দনের হার : ৮০-১২০ বার।	৪। উডচাক। দেহের উষ্ণতা : ১৬° সেন্টিগ্রেড। মিনিটে হৃদস্পন্দনের হার : ৩-১০ বার।

দেখা গেছে, গায়ে প্রচুর লোম থাকা সত্ত্বেও ভাল্লুক অত্যন্ত শীত-কাতুরে। এই কারণেই শীতের আগেই গর্তের মধ্যে শুক্‌নো পাতা বিছিয়ে একটা সুন্দর শয্যা তৈরী কোরে নেয় শীতঘুম দেবার জন্যে। একটা মজার ব্যাপার হলো, প্রথমেই স্ত্রী-ভাল্লুকটি গর্তে প্রবেশ করে, আর তার পিছু পিছু স্বামী মহাশয়টি তাকে অনুসরণ করে। শীতের সময় প্রায় দু'শো কিলোগ্রাম ওজনের দেহটিকে সমান উষ্ণতায় রাখবার জন্যে ভাল্লুক সারাটা শীত সেই গর্তে অনাহারে নিস্পন্দ অবস্থায় কাটায়। তবে অন্যান্য প্রাণীদের দেহের উষ্ণতা যতটা নেমে যায়, ভাল্লুকের দেহের উষ্ণতা ততটা কমে যায় না। বাইরের উষ্ণতা শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে নেমে গেলেও এদের দেহের উষ্ণতা ৩১-৩৪° সেন্টিগ্রেডের মধ্যেই থাকে। এই কারণে ভাল্লুককে আংশিক শীত-যাপনকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে গিরগিটি, সাপ, গোসাপ, কচ্ছপ, কুমীর প্রভৃতি সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীরা কনকনে ঠাণ্ডায় বেরায় না। সাপ গর্তের মধ্যে কিম্বা গাছের ফোকরে নিজের লম্বা শরীরটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে অসাড় অবস্থায় পড়ে থাকে। শীতপ্রধান দেশের কচ্ছপরা তুষারপাতের সময় বরফের নিচে বেশ আরামে ঘুমোয়। তবে উভচর (যেমন ব্যাঙ ইত্যাদি প্রাণীরা) ও সরীসৃপদের মতো ঠাণ্ডা-রক্তের প্রাণীদের মধ্যে মাছের শীত-ঘুমের ব্যাপার নেই বললেই চলে। এসব মাছ সমুদ্রেই বাস করে। কিন্তু খাল, বিল, নদী ও পুকুরের মিঠে জলের মাছদের শীত-ঘুম দেখা যায়। রুই, কাতলা প্রভৃতি পোনা মাছ শীতকালের জলের তলায় প্রায় পাঁকের কাছাকাছি এসে পরস্পরের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে একটি বৃত্ত রচনা করে। অন্যদিকে বেশীর ভাগ কীটপতঙ্গ শীত-ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেও মৌমাছিরা শীতে ঘুমোয় না, বরং মৌচাকের উষ্ণতা বজায় রাখার জন্যে তারা দ্রুত তালে ডানা কাঁপায়। অধিকাংশ মাকড়শা শীতে ঘুমোয় না, তবে 'ট্র্যাপডোর' (Trap-door) মাকড়শা বাসার গর্তের মুখ লালা ও মাটি মিশিয়ে বন্ধ কোরে দেয় এবং নিশ্চিন্তে ঘুমোয়।


খরগোসের 'শীত-ঘুম'

শীত-ঘুমের সময় এমন সব আশ্চর্য দৃশ্য চোখে পড়ে যা সহজে ভোলা যায় না। শীতের সময় বিভিন্ন প্রজাপতির সাপ এক সঙ্গে জড়াজড়ি কোরে ঘুমোয়; অন্য সময় কিন্তু এরা পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। দেখা গেছে, উত্তর আমেরিকার বারো ফুট একটি দীর্ঘ গর্তে এক শীতের সময় অত্যন্ত বিষধর আড়াইশো র‍্যাটেল সাপ, বেশ কিছু ব্যাঙ, গিরগিটি, কচ্ছপ, ইঁদুর, খরগোশ, মেঠো কাঠবেড়ালী, পেঁচা প্রভৃতি প্রাণীদের একসঙ্গে শীত-ঘুমে আচ্ছন্ন থাকতে। এ সময় এদের ঘুমের গাঢ়তা এমনই হয় যে খোঁচা খেলেও ঘুম ভাঙে না। বললে বোধ হয় ভুল হবে না যে, শীত-ঘুমের সময় সকলেই বন্ধু, কেউ কারও শত্রু নয়।

সারাটা শীতকাল শীত-ঘুমে কাটাবার পর যখন বসন্তের ছোঁয়া লাগে তখন এসব প্রাণীরা ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর এসব প্রাণীদের দৈহিক পরিবর্তনের যেসব লক্ষণ দেখা যায় তা জীববিজ্ঞানীরা পরীক্ষা কোরে দেখেছেন। পরিবেশের উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটলে শীত-ঘুমে আচ্ছন্ন প্রাণীরা ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। এর পর দেহের উষ্ণতার সঙ্গে বাইরের উষ্ণতাকে নিয়ন্ত্রণ কোরে নেয়। তবে ঠাণ্ডা রক্তের প্রাণীদের এই কাজটা সারতে হয় না, কেননা পরিবেশের ওপরই তাদের দেহের উষ্ণতা নির্ভর করে। প্রায় দেখা যায়, শীত-ঘুম ভাঙার পর এসব প্রাণীরা প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে থাকে। এর ফলে দেহের উষ্ণতা বেড়ে যায় এবং স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ফিরে আসে। মেঠো কাঠবেড়ালী ও হ্যামস্টারদের শীত-ঘুম ভেঙে স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে সময় নেয় ১ ঘণ্টার মতো। অবশ্য দীর্ঘ দেহধারী প্রাণীদের এই সময়টা লাগে অত্যন্ত বেশী। তাছাড়া এই সময় তাদের ক্ষুধার তীব্র তাড়না দেখা যায়।

বর্তমান কালে জীববিজ্ঞানীরা বলছেন, যে শীত-ঘুম কেবলমাত্র পরিবেশ নির্ভর নয়, জীবনের গভীরে যে অদৃশ্য 'জৈব-ঘড়ি' (Biological clock) রয়েছে তার দ্বারাও তারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জাগরণ প্রভৃতি যেমন 'আহ্নিক-ঘড়ি'র (Circadian Clock) দ্বারা পরিচালিত হয়, তেমনি শীত-ঘুম নিয়ন্ত্রিত হয় 'বার্ষিক-ঘড়ি' (বা সারক্যানুয়াল ক্লক)। জীববিজ্ঞানীরা আমেরিকার গুহাবাসী কাঠবেড়ালীর ওপর পরীক্ষা কোরে দৈনিক ও বার্ষিক ছন্দ-পরিক্রমার চমকপদ সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই প্রজাতির প্রাণীরা শীত-ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে। তাই গ্রীষ্মকালে কৃত্রিম শীতকক্ষে হিমাঙ্কের কাছাকাছি উষ্ণতায় এদের রাখলেও এরা শীত-ঘুমে আচ্ছন্ন হয় না। আবার এসব প্রাণীদের শীতকালে ৩৫° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা-বিশিষ্ট কক্ষে রেখে দেখা গেছে যে, কক্ষে আলো ও উষ্ণতা বেশী থাকলে এরা ঘুমতে পারে না বটে, কিন্তু প্রচুর খাদ্য দিলেও অনাহারে থাকে এবং শীত-ঘুমের সময় দেহের যে-যে পরিবর্তনগুলো দেখা যায় তার লক্ষণও ফুটে ওঠে।

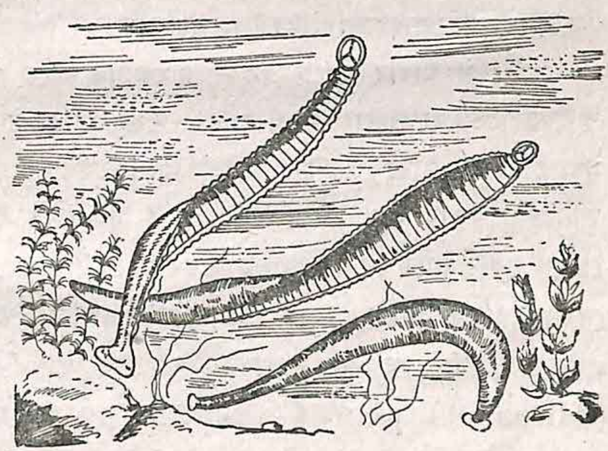
বিহঙ্গ-জগতে যাযাবরী বৃত্তিও বার্ষিক-ঘড়ির ছন্দে ছন্দে চলে। লক্ষ কোটী বছর ধরে প্রাণীদের জীবনে পরিবেশের গভীর ঘাত-প্রতিঘাতে যে

ছন্দ গড়ে উঠেছে তা বংশগতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলে গিয়েছে। কোনো ছন্দ পতন ঘটলেই জীবনের অস্তিত্বের সংকট দেখা দেবে। সুতরাং কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করেও এই জীবন-ছন্দকে আকস্মিক ভাবে পরিবর্তন করা যায় না। বিজ্ঞানীরা তাই প্রাণীদের শীত-ঘুমের জৈবিক-ক্রিয়া-ছন্দের রহস্য ভেদ করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন।

জীবজগতে এই রহস্য আছে বলেই আমাদের বিস্ময়।

রক্তচোষা জোঁক

এক সময় মানুষ ভাবতো, যে-কোনো রোগগ্রস্থ ব্যক্তিদের দেহে বেশ কিছু পরিমাণ বদ্-রক্ত আছে, এবং ঐ বদ-রক্তকে বার কোরে দিতে পারলেই রুগী সুস্থ হয়ে উঠবে। সুতরাং যে-কোনো রুগীকে সারিয়ে তুলতে হলে রোগীর দেহ থেকে বদ্-রক্তকে মোক্ষণ করতেই হবে। তাই দেখা যায় রুগীর দেহে যদি জোঁক বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তারা সহজেই বদ্-রক্ত চুষে নিতে পারবে, রুগীও হয়ে উঠবে সুস্থ। যাঁরা সেদিন এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে জোঁক ব্যবহার কোরে রুগীর রোগ উপশমের কথাটা ভাবতেন তারা আদ্যি-কালের ডাক্তার। এমন কি উনিশ শতকের ডাক্তাররাও কোনো কোনো অসুখে রুগীকে সারিয়ে তোলবার জন্যে জোঁকের ব্যবহার করতেন। তাই দেখা যায় জোঁকের কারবার কোরে কিছু ব্যক্তি বেশ দু'পয়সা উপার্জন কোরে নিয়েছিলেন। এই সব জোঁক রাখা হতো বড় বড় কাঁচের জলভর্তি জারে, কিম্বা গ্লাসে। জোঁক ব্যবসায়ীরা চাহিদা



জোঁক

অনুযায়ী জোঁক ব্যবসা করতেন। ১৮২৪ সালে এশিয়া থেকে ইউরোপে প্রায় ৫০,০ ,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) জোঁক চালান দেওয়া হয়েছিলো। বিশেষ কোরে যাঁরা হাতে-পায়ের বাত-বেদনায় কষ্ট পেতেন, ডাক্তারদের নির্দেশ মতো ঐসব স্থানে জোঁক বসিয়ে দেওয়া হতো। রক্ত লোলুপ জোঁকও ঐসব স্থানে বসে বসে রক্ত চুষতো ; তারপর আবার ঐ রক্তচোষা জোঁক-গুলোকে নির্দিষ্ট পাত্রে রেখে দেওয়া হতো। বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোতে জোঁকের ব্যবহার না থাকলেও প্রাচ্যের বেশ কিছু দেশে এখনও জোঁকের ব্যবহার আছে এবং ব্যবসাও চলে।

জোঁকের দেহটা অনেকটা চ্যাপ্টা গোছের। এদের গায়ের রং কালো, কিম্বা বাদামী অথবা সবুজ। জোঁকেরা আবার লম্বায় বিভিন্ন মাপের হয়ে থাকে। কখনও হয় এক ইঞ্চির থেকে ছোটো আবার কখনো তিন ফুটের চেয়েও লম্বা। বেশীর ভাগ জোঁক থাকে মিঠে জলে, তবে যারা লম্বায় বড় তারা লোনা জলেও স্বচ্ছন্দে বসবাস করে। আর ডাঙায় যেসব জোঁক থাকে তারা আকারে ছোটো। বিশেষ কোরে বর্ষাকালে বন-জঙ্গলে, ঘাসের ডগায় এরা থাকে অনেকটা নেতিয়ে পড়া অবস্থায়। কিন্তু রক্তের গন্ধে একটা হিল্ হিলে কায়দায় দেহটাকে দোলায়।

জোঁকের মাথার কাছে একটা চোষক মুখ আছে এবং এখানেই রয়েছে সূক্ষ্ম করাতের মতো ধারালো দাঁত। তাছাড়া মাথার উল্টো দিকেও চোষক মুখ রয়েছে। সামনে-পেছনের চোষক মুখ চেপে চেপে জোঁকের চলা-ফেরা। তাছাড়া শিকার ধরে পেছোনের চোষক মুখ চেপে ধরে, তারপর সামনের চোষক মুখের কাছে যে ধারালো করাতের মতো দাঁত আছে তা দিয়ে চামড়া কেটে দেয়। তারপর মুখ থেকে এক ধরনের লালা ঝরিয়ে দেয় ক্ষত স্থানটিতে, লালা-গ্রন্থি থেকে যে পদার্থটি ঝরিয়ে দেয় সেই পদার্থটিকে বলে 'হিরুডিন' (Hirudin)। এই পদার্থ কোনো ক্রমেই রক্তকে জমাট বাঁধতে দেয় না। সুতরাং জোঁকও তার আগ্রাসী রক্ত-ক্ষুধা মেটাতে কোনো বাধা পায় না।

চোষা-রক্ত জোঁকের পরিপাক নালীর মধ্যে দিয়ে গিয়ে থলিতে থলিতে জমতে থাকে। দেখা গেছে, একটা জোঁক পরিপূর্ণ রক্ত খাবার পর তার দেহের ১০ গুণ ওজন বাড়িয়ে তোলে। তবে থলিগুলো রক্ত বোঝাই হয়ে

গেলে জোঁক শিকার-করা-দেহ থেকে আপনা আপনি পড়ে যায় ; দেহটাও ফুলে-ফেঁপে টস্‌টসে্‌ হয়ে পড়ে। দেখা গেছে, একবার রক্ত খেলে জোঁকের আর ২০০ দিনের মতো খাবার দরকার হয় না।

জোঁক রক্ত খায়, সুতরাং বদ্‌-রক্ত খায় কথাটা ঠিক নয়। জোঁক কোনো প্রাণীর দেহে বসে যখন রক্ত চোষে তখন সেই প্রাণীটি কোনো ধরনের যন্ত্রণা অনুভব করে না। রক্ত চোষা শেষ হবার পর জোঁক যখন গা থেকে ঝরে পড়ে তখনই বুঝতে পারা যায় যে গায়ে জোঁক বসেছিলো—কেননা তখনও ক্ষত-স্থান থেকে রক্ত ঝরা বন্ধ হয় না। তবে জোঁক মোটেই বিযাক্ত কীট (ওয়ার্ম) নয়। তবে গভীর বন-জঙ্গলে মানুষ বা অন্য প্রাণী ঝাঁক্‌ ঝাঁক জোঁকের আক্রমণে পড়লে প্রাণ হারাতে পারে।

চিকিৎসকরা এক সময় জোঁক দিয়ে রোগীর চিকিৎসা করতেন বলে চিকিৎসকদের 'জোঁক' বলা হতো। কথাটা কি অর্থে ব্যবহার করা হতো আমরা জানি না। তবে 'জোঁকের মুখে নুন' কথাটার অর্থ আমরা জানি।

অমৃতস্বরূপ মাতৃদুগ্ধ

যে-সব প্রাণীরা স্তন্যপায়ী জীব-গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে না তারা জীবন সংগ্রামে যথার্থ অর্থে বিজয়ী হতে পারে নি। এসব প্রাণীদের জীবন—তারা জলের মাছই হোক্‌ কিম্বা উভচর প্রাণীই হোক—স্তন্যপায়ী প্রাণীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যদি বলা যায় জলের মাছ কিম্বা উভচর প্রাণীরা অলিম্পিক ক্রীড়াবিদদের মতো বলিষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল, বুদ্ধি ও চাতুর্যে অসাধারণ দক্ষ, তাহলেও বলতে হবে তাদের বাচ্ছারা জীবনযুদ্ধে খুবই কমক্ষেত্রে জয়ী হতে পেরেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এইসব প্রাণীদের বিবর্ত্তনের হার খুবই শ্লথ, কেননা অভিযোজন ক্ষমতায় তারা স্তন্যপায়ী জীবদের ধারে-কাছে ঘেঁসতে পারে না।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, যে-সব প্রাণীরা জোর কদমে চলা-ফেরা করতে পারে এবং যারা লম্বা ধারালো দাঁতের অধিকারী তারাই জীবন-যুদ্ধে জয়ী হতে পেরেছে। তাছাড়া এই সব স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মস্তিস্ক এমনভাবে উন্নত হয়েছে যা তাদের দিয়েছে বেঁচে থাকার উপযুক্ত ক্ষমতা। স্তন্যপায়ী

প্রাণীদের বাপ-মায়েরা বাচ্ছাদের খাদ্য সংগ্রহ করতে শেখায়, শেখায় কি ভাবে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। কেননা বাপ-মায়েরা আবার তাদের বাপ-মায়ের কাছ থেকে এমন সব শিক্ষা পেয়েছিলো ; তাছাড়া তারা নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে যা জেনেছে তাও জানিয়ে দিয়ে ও বুঝিয়ে দিয়ে যায় তাদের নিজ নিজ সন্তানদের। এভাবেই পুরুষানুক্রমে স্তন্যপায়ী জীবেরা পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে এবং বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, অন্য প্রাণীদের মস্তিষ্ক স্তন্যপায়ী জীবদের মত বিকশিত এবং উন্নত হতে পারে নি। এই উন্নত মস্তিষ্কের জন্যই স্তন্যপায়ী প্রাণীরা অন্যান্য প্রাণীদের থেকে নিজেদের আরও প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, এবং শেষ পর্যন্ত বিবর্ত্তনের ধারা পেরিয়ে মানুষের উদ্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে কথাটা বাড়াবাড়ির মতো শোনালেও এ কথাটা বাস্তব সত্য যে, দুধই হলো মানুষ নামক প্রাণীটির মানুষ হয়ে ওঠার প্রধান শর্ত হিসাবে বিবেচিত হতে বাধ্য।



পাতিহাঁস

বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, সঠিক ভাবে বলা যাচ্ছে না কি ভাবে মায়েরা সন্তান পালনের জন্য স্তন্যদান করাতে শিখলো। সন্তান-প্রসবের জন্যেই মায়েরা স্তন্যদান করাতে পেরেছে, না স্তন্যদান করাতে পেরেছে বলেই মায়েরা

সন্তান প্রসব করেছে—তর্কটা খুবই জটিল। তবে এমন কিছু ধরনের পাতি হাঁস (Duck-bill) আছে যারা ডিম পাড়লেও পরবর্তীকালে ডিম-ফোটা বাচ্ছাদের স্তন্যদান করায়। তাহলে বলতে হয় মায়েরা স্তন্যদান করার কাজটা আগেই শিখে নিয়েছিলো।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের স্তনগ্রন্থিগুলো (Mammary gland) কি ভাবে উদ্ভব হয়েছে সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা প্রচুর গবেষণা করেছেন এবং আকর্ষণীয় সব তথ্য পেয়েছেন। বিজ্ঞানীদের ধারণা হলো, ঘর্মগ্রন্থিগুলোই (Sweat glands) স্তনগ্রন্থিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানের যে-সব স্তন্যপায়ী প্রাণীরা আছে তাদের পূর্ব-পুরুষের দেহে অনেক স্তনগ্রন্থি থাকতো যাদের মুখগুলো খোলা। কেননা কোনো ধরনের স্তনবৃন্ত সেখানে ছিলো না। বিজ্ঞানীরা পাতিহাঁস (Duck-bill)-দের দেহ পরীক্ষা কোরে দেখেছেন যে, এদের দেহে প্রায় দু'শোর মতো গ্রন্থি আছে এবং পেটের কাছেতে যে গ্রন্থিগুলো রয়েছে তাদেরই বলা হয় স্তনগ্রন্থি। এদের দেহ পরীক্ষা কোরেই বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, ঘর্মগ্রন্থি (Sweat gland) থেকেই স্তনগ্রন্থির (Mammary gland) উদ্ভব হয়েছে। লোম আর পালকে আচ্ছাদিত জায়গাটায় রয়েছে স্তনগ্রন্থি যা একসময় ঘর্মগ্রন্থি ও চর্বিগ্রন্থি থেকে উদ্ভুত হয়েছে। এই স্তনগ্রন্থি থেকেই ধীরে ধীরে দুগ্ধ ক্ষরণ হয় যা বাচ্ছারা চুষে চুষে খেয়ে বড় হতে থাকে। উন্নত ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র স্তনগ্রন্থি গড়ে ওঠে, আর স্তন-দুগ্ধের ক্ষরণ পথগুলো এখানে এসে মিলে যায়। অনেক ক্ষেত্রে স্তনগ্রন্থিগুলো বেশ বড় আকারের হতেও দেখা যায়। এখানকার উন্নত জাতের গোরু-মোষের বাঁটগুলোকে লক্ষ্য করলেই এটা বোঝা যায়। একটি ইঁদুরের স্তনগ্রন্থি তার ওজনের শতকরা সাত ভাগ হয়, তবে ইঁদুরের বাঁটে দুধ জমা হলে তার স্তনগ্রন্থির ওজন তার দেহের ওজনের শতকরা কুড়ি ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। এই জন্যে সাধারণ পদ্ধতিতে গোরু-মোষ-ছাগলের কতটা দুধ দেওয়া উচিত তা ঠিক করতে পারা যায় না বলেই বিজ্ঞানীরা দুধদোহা যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন।

প্রত্যেক প্রাণীদের স্তনদুগ্ধেই আছে প্রোটিন, ফ্যাট, ল্যাকটোজ (এক বিশেষ ধরনের কার্বোহাইড্রেট যা কেবলমাত্র দুধেই পাওয়া যায়), ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাঙ্গানীজ, ক্লোরিন, পটাসিয়াম এবং অন্য নানা ধরনের খনিজ পদার্থ, ভিটামিন এবং হরমোন। একটি বাচ্ছার স্বাভাবিক পুষ্টির জন্যে খাদ্যে যে-সব উপাদান থাকা উচিত মাতৃ-দুগ্ধে তাই থাকে। তবে যে-সব প্রাণীর

বাচ্ছারা তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে তারা মাতৃ-দুগ্ধ থেকে বেশী পরিমাণ প্রোটিন ও ফ্যাট পেয়ে থাকে। দেখা গেছে, 'সীল' ও 'ধূসর তিমিদে'র মায়েদের স্তনদুগ্ধে শতকরা ৫৩ ভাগেরও বেশী ফ্যাট থাকে। এই কারণেই দেখা যায় বাচ্ছা তিমির ওজন প্রতিদিন ১০০ কিলোগ্রামের মতো বাড়তে থাকে। খরগোশের দুধে শতকরা ২৫ ভাগ আছে ফ্যাট। এই কারণে মা-খরগোশ তার বাচ্ছাদের সপ্তাহের মধ্যে দু'তিন বারের মত স্তন্য পান করায়। গো-দুগ্ধে ও মাতৃ-দুগ্ধে (মানুষের বেলায়) ফ্যাটের পরিমাণ খুবই কম (শতকরা ৩ থেকে ৬ ভাগ পর্যন্ত)। তাছাড়া মাতৃ-দুগ্ধ সব থেকে মিষ্টি, কেননা এই দুধে শর্করার (ল্যাকটোজ) পরিমাণ হলো শতকরা ৭ ভাগ।

বিজ্ঞানীরা বলছেন যে পেটের মধ্যে যত বেশী দিন বাচ্চা থাকবে স্তন দুগ্ধের ক্ষরণও হবে বেশীদিন ধরে। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনটা ঘটে না। যেমন, পাতি-হাঁস (Duck-bill) ১৩।১৪ দিন ধরে ডিমে 'তা' দিলেও বাচ্চারা মায়ের দুধ পায় তিন-চার মাস ধরে। গিনিপিগদের বেলায় দেখা যায় বাচ্চারা পেটে থাকে দু'মাস, কিন্তু বাচ্চা হলে তারা ১০ থেকে ১২ দিন মায়ের দুধ পায়। আশ্চর্যের ব্যাপারটা হলো 'সীল'-দের ক্ষেত্রে। ২৭৫ দিন ধরে মা-সীল তার পেটে বাচ্চা বহন করে কিন্তু প্রসব হবার পর বাচ্চারা ১৪ থেকে ১৭ দিন পর্যন্ত মায়ের দুধ পায়।

মানবশিশুর স্তন্যপানের সময়-সীমা সত্যই বৈচিত্র্যময়। পলি-নেশিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলে প্রথা আছে যে সন্তানরা ৬ বছর পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ খায়। এস্কিমো-মায়েরা তাদের সন্তানদের দীর্ঘদিন ধরে স্তন্য পান করায়; কথাটা আশ্চর্যের মতো শোনালেও এখানকার সন্তানরা প্রায় পনের বছর পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ খায়। মুসলিম দেশগুলোর কোনো কোনো জায়গায় আমীর বাদশাহদের ছেলেমেয়েদের জন্য নিযুক্ত হতো নানা দেশের ধাই-মা। এই ধাই-মায়েরা বছরের পর বছর তাদের প্রভুদের সন্তানদের বুকের দুধ দিয়ে মানুষ কোরে তুলতো।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে যারা উন্নত পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে সেই সব প্রজাতির মেয়েদের নির্দিষ্ট সংখ্যার স্তনগ্রন্থি আছে। মানব জগতের নারীদের দু'টি স্তনগ্রন্থি আছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে আরও স্তনগ্রন্থি থাকে যা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয় না। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, কিছু কিছু জাতির নারীদের এই ধরনের বাড়তি স্তনগ্রন্থি দেখতে পাওয়া যায়; জাপানী নারীদের চারজন থেকে পাঁচজনের মধ্যে এই ধরনের স্তনগ্রন্থি আছে।

প্রাচীনকালের মানুষরা জানতেন যে, নারীর দু'য়ের অধিক স্তনগ্রন্থি থাকতে পারে। তাই অনেক ক্ষেত্রে বসুমাতার সাতটি স্তনগ্রন্থির নজীর টেনেছেন। যেমন, রিয়া সাইবেলে (Rhea Cybele)। অবশ্য বিশ্বের আধুনিক নারীরা বেশীর ভাগই দু'টি কোরে স্তনগ্রন্থি বহন করছেন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, সন্তান ধারণের সময় স্তনগ্রন্থির স্ফীতি প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলশ্রুতি।



বসুমাতা

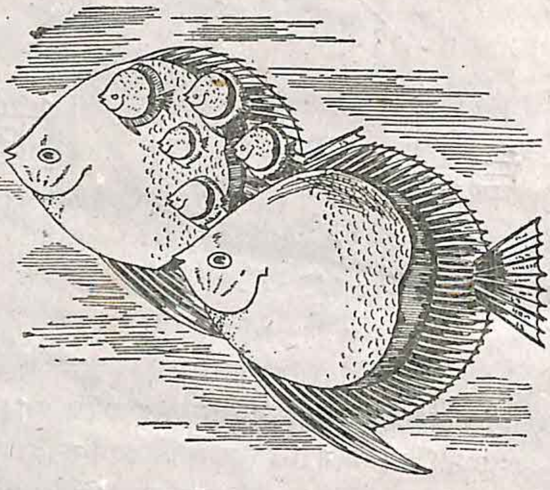
কোন নারীর স্তনগ্রন্থি যদি প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলশ্রুতি হয় তাহলে পুরুষের স্তনগ্রন্থি না থাকারই কথা। কথাটা তাই রঙ্গ-ব্যঙ্গের মতো শোনালেও কেউ কেউ বলে থাকেন 'বলদের দুধ'। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন যে পুরুষের স্তনগ্রন্থি আছে, আর এ স্তনগ্রন্থি অপ্রয়োজনীয় হলেও দীর্ঘদিন পুরুষরা এই স্তনগ্রন্থি বহন করছে।

বিজ্ঞানীরা আমাদের চমক্ দিয়ে বলছেন যে, পুরুষের স্তনগ্রন্থি একবারে কার্যকর-শক্তিবিহীন, এ কথাটা ঠিক নয়। যদিও পুরুষের স্তনগ্রন্থির বাড়ন্তভাব পরিপূর্ণ নয়, তবুও নির্দিষ্ট বয়সকালের মধ্যে স্তনগ্রন্থির বিকাশ অব্যাহত তো থাকেই, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুগ্ধ ক্ষরণও হয়। কিছু কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মায়েরা যখন সন্তান প্রসব করে তখন পিতামাতার দু'জনের স্তনগ্রন্থি থেকে দুগ্ধ ক্ষরণ হয়। তবে পুরুষযেহেতু সন্তানদের স্তন্য দান করায় না, সেই কারণেই পুরুষের বুকের দুধ অপচয় হয়। সুতরাং যাঁরা কৌতুক কোরে বলেন 'বলদের দুধ' পাওয়ার কথা, চেষ্টা করলে 'বলদের দুধ' খাইয়ে তাঁদের মুখ বন্ধ কোরে দেওয়া যেতে পারে।

আমরা সকলেই জানি মাছ, ব্যাঙ, সাপ, পাখী প্রভৃতি প্রাণীদের বুকের দুধ হয় না। কিন্তু পৃথিবীতে স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাবের আগে প্রকৃতি

মোটেই কৃপণা ছিলেন না। বহু প্রজাতির প্রাণী ও কীট-পতঙ্গেরা পিতা-মাতার কাছ থেকে দুধ পেয়ে থাকতো। দেখা গেছে, এমন কিছু রক্ত-চোষা মাছি আছে যারা জন্ম মুহূর্তের লগ্নে মায়ের পেটের থলিতে থাকে এবং সেখান থেকে যে তরল পদার্থটি ক্ষরণ হয় তা পান করেই তারা বড় হতে থাকে। এই তরল পদার্থটিতে থাকে প্রোটিন, ফ্যাট ও অন্য ধরনের পুষ্টিদায়ক উপাদান।

মৌমাছিদের দেহ থেকেও দুগ্ধ ক্ষরণ হতে দেখা যায়। বিশেষ কোরে শ্রমিক মৌমাছিদের চোয়ালের তলায় থাকে এই স্তনগ্রন্থি। আবার কীট-পতঙ্গেরা যখন তাদের শুককীটগুলোকে পরিচর্যা করে তখন তারা জীবের লালা দিয়ে শুককীটগুলোকে চাটতে থাকে। লালার পুষ্টি-রসে শুককীটগুলো পুষ্ট হতে হতে কীট-পতঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে যায়।


মাছের স্তন্যপান

আমাজন নদীতে এমন কিছু প্রজাতির মাছ আছে যারা তাদের বাচ্চাদের বিচিত্র উপায়ে বড় কোরে তোলে। এই সব বাচ্চাদের বাপ-মায়ের দেহ থেকে মিউকাস বেরোয় এবং মাছেরা বাপ-মায়ের দেহ থেকে এই মিউকাস ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খেয়ে খেয়ে বড় হয়। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, বেশীর ভাগ পাখী তাদের বাচ্চাদের স্তনগ্রন্থির দুধ দিয়ে বড় কোরে তোলে। সুতরাং 'পাখীর দুধ' কথাটা বিস্ময়ের হলেও কথাটা বাস্তব সত্য।

তাহলে কথাটা দাঁড়ালো যে, প্রকৃতি কৃপণা নন। তিনি যে বিচিত্র উপায়ে বৈচিত্র্যময় পদ্ধতিতে পশুপাখীর, কীটপতঙ্গের খাদ্যের ভাণ্ডার মজুত রেখেছেন তা আজও আমরা সম্পূর্ণ ভাবে জানি না। তবে বিজ্ঞানীরা এ-কথাটা জোর দিয়ে বলছেন যে, বাচ্চাদের পরিচর্যার ব্যাপারে মায়ের ভূমিকাটা শেষ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। আর মাতৃদুগ্ধ পান কোরে যে সব শিশুরা বড় হয় তারাই হলো প্রকৃতির মমতা-মাখানো স্নেহ-রসে পুষ্ট। এ কথাটা মোটেই ভোলা উচিত নয়।

———